দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

ভাবুন
পঁচাত্তরটি 'সত্যিকথা'
ভোটদিন তারপর
— পৃঃ ৩৫

মোদী-মমতা তরজা
মোদীর আক্রমণে
বেসামাল মমতা
— পৃঃ ৬

৭১ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ৬ মে ২০১৯।। ২২ বৈশাখ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com



বনাম



শীর্ষ আদালতে নতমস্তক রাহুল গান্ধী ক্ষমা চান মোদীজীর কাছেও



স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ২২ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৬ মে - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

খোলা চিঠি : শুধু মোদী নয়, গদি নিয়েও ভয় দিদির
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৬

মোদী-মমতা তরজা : মোদীর আক্রমণে বেসামাল মমতা
▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ৮

ড. শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে হিন্দু বাঙ্গালির বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গ ▯ বিনয়ভূষণ দাস ▯ ১১

কান মলছি ধর্মাবতার, এমন কাজ আর কখনও করব না ▯ ১৩

শীর্ষ আদালতে নতমস্তক রাহুল গান্ধী ক্ষমা চান মোদীজীর কাছেও ▯ সনাতন রায় ▯ ১৪

রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব ও ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি— একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ▯ বিমল শঙ্কর নন্দ ▯ ১৬

রাজনীতির ভোটরঙ্গে আঁতেলের কুরঙ্গ ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৮

অক্ষয় তৃতীয়া সত্য-সুন্দরে একাত্ম হওয়ার দিন
▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

রবীন্দ্র সংগীতে উপনিষদের ভাবনা
▯ মালিনী চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩৩

ভাবুন পঁচাত্তরটি 'সত্যিকথা', ভোট দিন তারপর
▯ সনাতন রায় ▯ ৩৫

নববর্ষ দখল এবং বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ
▯ স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী ▯ ৪৩

কর্মহীন মানুষকে অর্থ সাহায্য দিয়ে দরিদ্র্য দূর করা যায় না
▯ মনীশ সাভারওয়াল ▯ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৪১**▯ **অন্যরকম : ৪২** ▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১৩ মে
২০১৯

স্বস্তিকা
আগামী সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
১৩ মে
২০১৯

পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া ঝড়

কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে ভোট লুঠ পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। বিজেপি কর্মীদের ওপর তৃণমূলের ভোটসন্ত্রাস অব্যাহত। কিন্তু তার পরেও পশ্চিমবঙ্গে যা চলছে তাকে গেরুয়া ঝড় বললে অত্যুক্তি করা হয় না। কলকাতা, শিলিগুড়ি, বোলপুর, শ্রীরামপুর, ঠাকুরনগর, ব্যারাকপুর— প্রধানমন্ত্রী যেখানেই যাচ্ছেন সভায় উপচে পড়ছে ভিড়। এরাজ্যের মানুষ তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর কথা শোনার জন্য ব্যাকুল। মানুষের আবেগের এই লহর দেখে বিচলিত মমতা। তৃণমূলের ভোটসন্ত্রাস মমতার ভয়েরই বহিঃপ্রকাশ। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই নিয়েই থাকবে কয়েকটি বিশেষ লেখা।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

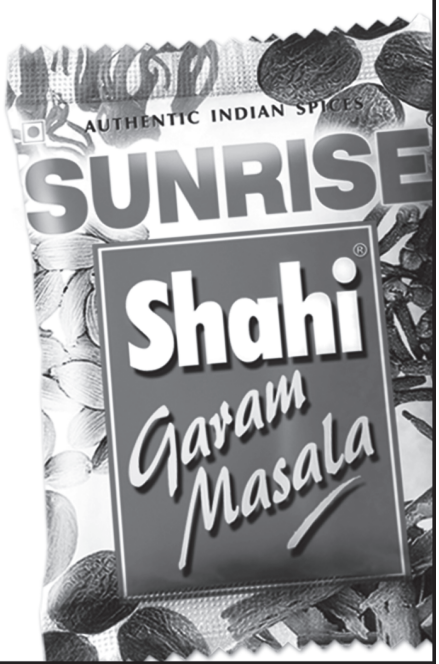
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা



SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মিথ্যার রাজনীতি

ভারতবর্ষে এক সময় রাজনীতি নীতির রাজা রূপে পরিগণিত হইত। জনকাদি রাজন্যবর্গ ইহার জন্য রাজর্ষি রূপে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাজনীতি রাজার নীতিতে অবতরণ করিয়াছে। বর্তমানে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হইলেও পারিবারিক শাসনতন্ত্র এই ভারতে দীর্ঘকাল চলিয়াছে। বস্তুত তাহাদের হাত ধরিয়াই নীতির রাজা আজ রাজার নীতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। তাহারা নিজেদের স্বার্থে রচিত নীতিকেই রাজনীতি আখ্যা দিয়া সত্য-মিথ্যা, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করিয়া দীর্ঘকাল দেশ শাসন করিয়াছে। তাহারা দেশের মানুষকে প্রজামাত্র মনে করিয়াছে। ইহা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। সেই অভ্যাসবশতই শতাব্দী প্রাচীন দলটির সভাপতি দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে রাফাল ইস্যুতে চোর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নামও জড়াইয়াছেন। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালত তাঁহাকে নোটিশ পাঠাইয়া জানাইয়া দিয়াছে যে, সর্বোচ্চ আদালত প্রধানমন্ত্রীর প্রতি এই রকম কোনও ভাষা ব্যবহার করে নাই। সুতরাং সর্বোচ্চ আদালতের নাম জড়াইয়া মিথ্যা কথনের জন্য সেই দলের সভাপতিকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মানিয়া সেই সভাপতিকে মুচলেকা দিয়া ক্ষমা চাহিতে হইয়াছে। বলিতে হইয়াছে 'রাজনৈতিক প্রচারে উত্তেজনার বশীভূত হইয়া তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন। সুপ্রিম কোর্টকে কোনও ভাবেই জড়ানো তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না'। রাজনীতি করিতে যাইয়া সত্য-মিথ্যার ধার না ধারিলে ফল কী হইতে পারে তাহা তিনি হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছেন।

শতাব্দী প্রাচীন এই দলটি এবং সেই ঘরানার রাজনীতিবিদরাই রাজনীতির মধ্যে হিংসা, ছলনা, মিথ্যা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। ইহারা কোনও দিন প্রকাশ্যে দেশবাসীকে জানান নাই যে, দেশের জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার জন্য একজন ইংরাজ রাজপুরুষের হাতে 'সেফটি ভাল্ব' হিসাবে এই দলটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব নিজেদের সঠিক পরিচয়টুকুও দেশবাসীর কাছে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। দেশের স্বাধীনতা এবং দেশবাসীর উন্নতি সাধন ইহাদের লক্ষ্য ছিল না। ইহাদের জন্যই দেশে কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইহাদের বিশ্বাসঘাতকাতার শিকার হইয়াছেন দেশের কয়েকজন জাতীয় নেতা। দীর্ঘ কয়েক দশক ইহারা দেশ শাসন করিয়া দেশকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করিয়াছেন। ইহাদের ঘরানারই একজন নেত্রী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাসন করিতেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত অবগুণই তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান। তাঁহার হিংসা, কপটতা ও মিথ্যার বিষবাষ্পে রাজ্যবাসী ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে।

আসলে শতাব্দী প্রাচীন এই দলটি ও তাহার ঘরানার নেতা-নেত্রীদের হাতে নূতন ভারতের রূপকার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবার মতো কোনও অস্ত্রই নাই। দেশবাসীর উন্নয়নে তাহাদের লক্ষ্য নাই। সন্ত্রাসবাদ নিরাকরণে তাহাদের কোনও কথা নাই। তাই তাহারা নিরন্তর মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হইয়াছেন। এমনকী প্রধানমন্ত্রীর পরিবারকে জড়াইয়াও অপশব্দ প্রয়োগ করিতেছেন। খুবই দুঃখের বিষয়, এই দলটির হাতে আজ কোনও যোগ্য ও পরিপক্ক নেতা নাই। তাহাদের বোধ হয় আভাষই হইতেছে না যে, তাহাদের সভাপতি যত জোরের সঙ্গে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' বলিতেছেন, দেশবাসী তত তাহাদের প্রতি বিরূপ হইতেছে। যতই বিরোধীরা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে গালমন্দ করিতেছেন ততই জনতা তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতেছেন। সর্বোচ্চ আদালতের ধমক খাইবার পরও মিথ্যা ভাষণ থেকে সেই সভাপতিটি বিরত হন নাই। এই হঠকারিতার জন্যই কংগ্রেস কোনওদিন দেশবাসীর মন জয় করিতে পারে নাই। এই জন্যই এই দলটির আজ দয়নীয় অবস্থা হইয়াছে। বর্তমান সভাপতির শিশুসুলভ আচরণে দলটি একেবারেই গ্রহণযোগ্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব চাইতে বড়ো কথা, শতাব্দী প্রাচীন এই দলটি যোগ্য বিপক্ষ রূপে নিজেদের তৈরি করিতে না পারিলে সংসদীয় গণতন্ত্র ও ভারতীয় রাজনীতির পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক হইবে না।

সুভাষিতম্

অপূর্ব কোঽপি ভাণ্ডারস্তব ভারতী দৃশ্যতে।
ব্যয়তো বৃদ্ধিমায়াতি ক্ষয়মায়াতি সঞ্চয়াৎ।।

হে মা দেবী সরস্বতী! তোমার ভাণ্ডারে কী অপরূপ শোভা! তোমার বিদ্যার ভাণ্ডারটি অপূর্ব— যা ব্যয় করলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আর সঞ্চয় করলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

মোদী-মমতা তরজা

মোদীর আক্রমণে বেসামাল মমতা

অভিমন্যু গুহ

একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী, আর তার অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভোটযুদ্ধে পরস্পরের মুখোমুখি হলে তাঁদের রাজনৈতিক বয়ান শুনতে পাওয়া যাবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রে অস্বাভাবিক ঘটনাই স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়। নইলে অভিনেতা অক্ষয় কুমারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী যখন গণতান্ত্রিক কাঠামোয় অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গাপুজোয় তাঁকে কুর্তা রসগোল্লা পাঠানোর কথা বলেন, তার পরে দেউলিয়া বাম ঝাঁপিয়ে পড়ে মোদী দিদি 'গটআপে'র অভিযোগে। আর সম্ভবত 'মুসলিম ভোট' হারানোর ভয়ে কাঁটা মোদীর সাক্ষাৎকারে বেজায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী রাগের চোটে বলে বসেন— 'এরপর কাদা আর স্টোনচিপসে ভরা রসগোল্লা পাঠাব মোদীকে, খেলে দাঁত ভেঙে যাবে।'

এধরনের অসাংবিধানিক বাচনভঙ্গিতে মমতা সিদ্ধহস্ত। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানোর ফরমান জারি করেছিলেন। প্রথম দিকে এসব মন্তব্যে রাজ্যের মানুষ খেপে যেতেন, এখন হাসেন। কিন্তু হাসি রাগের মধ্যে গণতান্ত্রিক সৌজন্য-শিষ্টাচারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হারিয়ে যায় না। রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় থাকে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গায়। এতো সরল ইক্যুয়েশন, কিন্তু রাজনীতিতেও কীভাবে অসুস্থতার সঞ্চার হতে পারে সাম্প্রতিক মমতা-মোদী তরজা তার অন্যতম প্রমাণ হয়ে থাকল।

মমতার কুর্তা রসগোল্লা পাঠানোর সৌজন্যকে স্বাভাবিক ভাবেই সম্মান জানিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। একইভাবে মমতার জন্মদিনের সময়ও বিজেপির রাজ্যসভাপতি সৌজন্য দেখিয়েছিলেন। বর্তমানে বিশেষ উদ্দেশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদলেহী একটি বাজারি সংবাদমাধ্যম দিলীপবাবুর মন্তব্য তুলে ধরে দেখাতে চাইল দিলীপ ঘোষ মোদীর বিরুদ্ধে গিয়ে মমতার পাশে দাঁড়িয়েছেন। রাজনীতিতে সৌজন্যতার পাঠ বামপন্থীরা কোনওদিন শেখেননি। ফলে মোদী-মমতা সৌজন্য তাঁদের কাছে অসহ্য লাগারই কথা, বিশেষ করে, ভারতীয়



রাজনীতিতে তাদের ভূমিকাটা যখন মানিক সরকারের কথানুযায়ী ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মতো। আর বামপন্থী মানসিকতা সম্পন্ন বাজারি মিডিয়া এই সৌজন্যের নজিরেও মমতাকে আড়াল করতে ব্যস্ত, 'রাজনীতি'র কারণেই।

এই 'রাজনীতি'টাই এইবেলা বুঝে নেওয়া দরকার, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তরজায় মমতা যতই মাঝে মধ্যে বিষয়টিকে হাসির খোরাক করে তুলুন বা 'বিলো দ্য বেল্ট' আক্রমণ করুন না কেন। রাজনীতির কারবারিদের একাংশ বহুদিন যাবৎ নরেন্দ্র মোদীর তীব্র বিরোধী, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির জন্য। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কেউ কারোর বিরোধী হতেই পারেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন কেউ এড়াতে পারেননি, সেটি হলো মোদীর বিকল্প কে? প্রথমে রাহুল গান্ধীকে তুলে ধরা হলো। সবাই দেখল প্রধানমন্ত্রীকে চোখ মারা, সংসদে মিথ্যে ভাষণ দেওয়া, আর জনসভায় জনগণকে প্রতারণা করা ছাড়া রাজনীতিতে রাহুলের আর কোনও ভূমিকা নেই। কংগ্রেসকে কেউ আসন ছাড়তে রাজি নয়। বিরোধী 'জোট' আর 'জোটের নেতা' সবটাই ফানুস, জোটের আগেই ফেটে যেতে বিকল্প নেতা খুঁজতে সবাই ব্যস্ত হলো মায়া, অখিলেশ, চন্দ্রবাবু ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে।

এমনকী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিরূপ হিসেবে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে তুলে ধরে বারাণসীতে মোদীজীকে প্রায় হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দশমণ তেলও পুড়লো না, রাধাও নাচল না। গান্ধী পরিবারের তরফ থেকে মোদীজীকে হারানোর স্বপ্ন ভোটের আগে এমনই দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো যে বারাণসী থেকে ভাই-বোন শুধু পালালেনই না, গান্ধী পরিবারের গড় রায়বেরিলি-আমেঠিতে মা-পুত্রের জেতাও এবার অনিশ্চিত। মায়া, অখিলেশ, চন্দ্রবাবুরা ভোটের আগেই সেফ-গার্ড নিয়ে নিয়েছিল। এই খেলা গত পাঁচ বছর ধরে চলছে। তাঁরা জিতলে মানুষের মোদী-বিরোধী রায়, আর হারলে ইভিএমে কারচুপি। এবারও সেই একই পথে কারচুপির গাওনা তাঁরা গেয়ে রেখেছেন।

এই পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প হিসেবে প্রজেকশানের খুব দরকার ছিল। কারণ উল্লিখিত নেতাদের পেশিশক্তির জোর নেই। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মমতা। প্রশাসন তাঁর কুক্ষিগত। রাজ্যের মিডিয়া তাঁর অনুগত। বুদ্ধিজীবীরা তাঁর তাঁবে থেকে মমতাজীবীতে পরিণত হয়েছেন। সর্বোপরি নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় প্রশাসনে থাকলে মমতা-অনুগামীদের চুরি বাটপাড়িতে সমূহ বিপদ, সেটাও সবাই জানে। তাই মমতা কারণে-অকারণে মোদী বিরোধী থেকে মোদী বিদ্বেষীতে পরিণত হয়েছেন। এই মোদী বিদ্বেষ অপরিণামদর্শী রাজনীতিক মমতাকে দেশবিদ্বেষীতে পরিণত করেছে। এবং একদল বামমনস্ক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তাদের প্রোপাগাণ্ডা, এজেন্ডা ছড়াতে সুকৌশলে মমতাকে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ফলে মমতাকে মোদীর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে এদের তাগিদ ছিল, বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টের অপপ্রয়োগ করে সারা দেশের সঙ্গে বাঙ্গলাকে বিচ্ছিন্ন করে আরবি

সংস্কৃতিতে লালিত-পালিত করার কামনা এরা করেছিল মমতার মোদী বিরোধিতাকে সম্বল করেই। তাই এখন পরিকল্পনামাফিক রটানো হচ্ছে মোদী মমতাকে ভয় পেয়েছেন, তাই বাঙ্গলায় বারে বারে ছুটে আসছেন ইত্যাদি। মোদী বনাম মমতার বক্তৃতার মূল বিষয়টি কী? মোদী বাঙ্গলায় তাঁর বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় তুলে ধরতে চেয়েছেন ভারতীয় সংস্কৃতিকে। আর মমতা প্রতিবারই সুযোগ বুঝে চলে গিয়েছেন দাঙ্গার প্রসঙ্গে। বিজেপিকে দাঙ্গাবাজ প্রমাণ করতে মমতা শুধু মুসলমান তোষণেই থেমে থাকেননি, দেশের বৃহত্তর হিন্দু জনগোষ্ঠীকেও অপমান করেছেন। জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামপুরে এক জনসভায় স্বভাবসিদ্ধ নিজস্ব হিন্দিতে মমতা বলেন : 'এন আর সি করে গা। কেয়া এন আর সি করেগা? এন আর সি-র নামে আপনাদের জিজ্ঞাসা করবে ১৯৫০ সালের সার্টিফিকেট আছে তো? নইলে সব বাদ। আমায় আমার মায়ের জন্মদিন কবে জিজ্ঞাসা করলে তো আমিই বলতে পারবো না। আপনারা কোত্থেকে বলবেন। সত্তর বছর আগের কাগজ আমি কোত্থেকে পাব? এরা এন আর সি-র নাম করে সবাইকে দেশ থেকে তাড়াতে।'

মমতার এই বক্তব্যে হাসির খোরাক বিলকুল আছে। কিন্তু রোহিঙ্গা-রাজনীতি আর ভুল বুঝিয়ে লোক খেপানোর পলিটিক্স যে মমতা তাঁর রাজনৈতিক তাস হিসেবে ব্যবহার করবেন তা ওই বক্তব্যে খুব স্পষ্ট। নরেন্দ্র মোদী একইসঙ্গে তাঁর বিভিন্ন জনসভায়, এরাজ্যে তো বটেই এমনকী বারাণসীতেও নিজের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় মমতার রাজত্বে বিজেপি-কর্মীদের ওপর লাগাতার আক্রমণ, অত্যাচার নিয়ে সরব হয়েছেন। ইলামবাজারে জনসভায় তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন ভোট 'দিদিগিরি'র জায়গা নয়। 'দাদাগিরি'রও নয়। ভোট ভারতীয় গণতন্ত্রের মহিমাকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার জন্য। বারাণসীতে তিনি বলেছিলেন, 'বাঙ্গলায় বিজেপি-কর্মীরা বোমা- বন্দুকের সামনে লড়াই করছে। বাড়ি থেকে বেরনোর



'বিজেপিকে দাঙ্গাবাজ প্রমাণ করতে মমতা শুধু মুসলমান তোষণেই থেমে থাকেননি, দেশের বৃহত্তর হিন্দু জনগোষ্ঠীকেও অপমান করেছেন।'

সময় বিজেপি কর্মীরা জানেন না তাঁরা আর বাড়িতে ফিরতে পারবেন কিনা।' দেশের প্রধানমন্ত্রীর এই সংবেদনশীল ভাষণ নিয়েও কতটা নোংরা রাজনীতি করা যায়, তা মমতায় সুযোগসন্ধানী একটি নকশালি বাজারি সংবাদমাধ্যম 'বারাণসীতেও মোদীর মুখে দিদি' গোছের খবরে দেখিয়েছে, মোদী নাকি মমতাকে ভয় পাচ্ছেন।

এমন হিংস্রতাকে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মোদীর ভয়ে যে তিনিও সমান আতঙ্কিত, তাই আরও বেশি আতঙ্ক তৈরির চেষ্টায় আছেন নিজের তখত রাখতে, আর এ কাজে বাজারি মিডিয়ারও যে মদত আছে, নানুরে ভোটের দিন একটি ভিডিওতে তা প্রকাশ্যে এসেছে। বাজারি মিডিয়ার বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেখানকার মহিলারা তাদের ওপর ধর্ষণের হুমকির জন্য একটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের দিকে হাত তোলা মাত্র 'শান্তি' বজায় রাখতে খবরটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, শ্মশানের শান্তিও 'শান্তি' অবশ্য। মমতার ভয় এই ভয়হারী মোদীকেই। যিনি প্রতিপক্ষের শত বাধা সত্ত্বেও এমন এক ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেন, যেখানে বৈষম্য থাকবে না, উপাসনা পদ্ধতিতে বিভিন্নতা থাকলেও বিভেদ থাকবে না।

এই জায়গাতেই মমতার সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাঁর রাজনীতি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমাদর পেলেও তা যে দেশের পক্ষে বিপজ্জনক তা রাজ্যবাসী এমন টের পাচ্ছেন। তাই পেশীশক্তির আস্ফালন করে মমতাকে এখন বলতে হচ্ছে—'গোটা ভারত সরকার নামান, বাঙ্গলায় শূন্য পাবেন মোদী'। ইতিমধ্যেই তিনি বারাণসীতে দাঁড়ালে সব ভোটই নাকি তিনি পাবেন, মোদীর কপালে একটি জুটবে না মমতার এ ধরনের হাস্যকর অবান্তর কথায় এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় মিমের ছড়াছড়ি। কিন্তু মমতার এই ভুলভুলাইয়ার মধ্যেও আরও বেশি চোখে লাগছে ভারত সরকারকেই তিনি শত্রু হিসেবে বেছে নিয়েছেন দেখে, মোদী বিরোধিতা করার অজুহাতে। আর একাজে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনকে ব্যবহার করতে চাইছেন তিনি। মোদীজীর কথায় কোনও অত্যুক্তি নেই যে 'বাংলাদেশি এনে বিজেপিকে হারানোর ছক কষছেন দিদি'। ঠিকই তো, এরাজ্য, এই দেশের ওপর, এই দেশবাসীর ওপর আর মমতার আস্থা নেই, ভিনদেশ ও ভিনদেশিদের ওপরই তাঁকে ভরসা করতে হবে, দেশদ্রোহী অভিযোগের সারবত্তা প্রমাণের জন্য মমতার মোদী-বিরোধী প্রচার অভিযানের দিকে লক্ষ্য রাখলেই যথেষ্ট। মোদী বিরোধিতা মানেই দেশ-বিরোধিতা নয় বলে যাঁরা গলা ফাটান, মমতা আর তাঁর তোষামুদে মিডিয়া এঁদের কাছে উদাহরণ হিসেবে গণ্য হতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'তৃণমূলের সূর্য অস্ত যাচ্ছে।' নির্বাচনী চোখরাঙানিতে রাজ্যবাসী সেই অপেক্ষায় দিন গুনছেন। ■

শুধু মোদী নয়, গদি নিয়েও ভয় দিদির

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

এই লোকসভা নির্বাচনকে মনে রাখতে হবে। এই প্রথম দেশে এমন একটা সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে যেখানে শাসকদলের পক্ষেই হাওয়া। না, বাংলার কথা বলছি না, এটা গোটা দেশের কথা বলছি।

গত লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশে বিজেপি ঝড় উঠলেও মোদী-হাওয়া থমকে গিয়েছিল মমতার রাজ্যে। মাত্র দুটি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল গেরুয়াবাহিনীকে। এবার কিন্তু লড়াই অতটা সহজ নয় তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য। তবে বিজেপিই একমাত্র ভয় মনে করলে কিন্তু ভুল করবেন। দিদি নিজেই নিজেকে ভয় পাচ্ছেন। দলের ভাই, ভাইপোরাও চিন্তায় রেখেছে।

আসলে পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকেই দিদির মাথায় চিন্তা ছিল, ক্ষমতা ধরে রাখা যাবে তো! তাই নিজের মতো করে ভোট করেছিলেন। কিন্তু এবার নির্বাচন কমিশন বিশেষ করে এই রাজ্যের জন্য এতটাই কড়া যে, চিন্তা থাকছেই। দিদি তাই মেজাজ রাখতে পারছেন না। দিদির এক বোন তো কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপরে হামলার হুমকিও দিয়ে রেখেছেন।

তবে দিদি মুখে বলছেন অন্য কথা। বলেছেন, "যতই দফা বাড়াও, যতই সেন্ট্রাল ফোর্স পাঠাও, পুরো ভারত সরকার নিয়ে ঘুরে বেড়াও, বাংলায় আমি জিতবই-জিতবই-জিতবই।" আবার কখনও বলছেন, "ভোটটা ফোর্স দেবে না। ভোটটা দেবে মানুষ। ওরা বুঝতে পারবে।"

কেন্দ্রীয়বাহিনী নিয়ে মমতা দিদির এই মন্তব্যের পরে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, তাহলে কি তৃণমূল নিজস্ব মেশিনারি দিয়ে ভোট করাতে পারছে না বলেই এই কথা? যেটা হয়েছিল পঞ্চায়েতে। নিন্দুকদের অনেকেই বলতে শুরু করেছিলেন, পঞ্চায়েতের মতো হাত খুলে খেলতে পারছে না বলেই তৃণমূলনেত্রী এই কথা বলছেন। দিদি বুঝতে পেরেছেন, এতে দলীয় কর্মীদের মনোবল ভেঙে যেতে পারে। তাই হয়তো ভোকাল টনিক দিতেই বাহিনী নিয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে এই কথা বললেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনিতেই প্রতি দিন নোটবাতিল থেকে সিবিআই সব কিছু নিয়েই মুখ খুলছেন আর বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি ভয় পাচ্ছেন। আর সেটা বুঝতে পেরেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "যে ভ্রষ্ট মোদীর তার জন্য নষ্ট।"

তবে দিদি তো বটেই, তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীরাও বুঝতে পারছেন, এ বার খেলা ঘুরবেই। তাই কর্মীদের চাঙ্গা করতেই দিদি এখন এসব বলছেন। ২৩ মে বিকেলের পর দুধ কা দুধ, পানি কা পানি সব পরিষ্কার হবে। সে ফল যাই হোক না কেন দিদির ভয়টা কিন্তু মিথ্যা নয়।

আর এই ভয়ের পিছনে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য একটা বড়ো কারণ। দফায় দফায় রাজ্য এসে তিনি কী কী বলেছেন একবার সেটা দেখে নিলেই বোঝা যাবে কেন এত ভয়।

দিদি তো বটেই, তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীরাও বুঝতে পারছেন, এ বার খেলা ঘুরবেই। তাই কর্মীদের চাঙ্গা করতেই দিদি এখন এসব বলছেন। ২৩ মে বিকেলের পর দুধ কা দুধ, পানি কা পানি সব পরিষ্কার হবে। সে ফল যাই হোক না কেন দিদির ভয়টা কিন্তু মিথ্যা নয়।

নদিয়া থেকে বীরভূম, হুগলি থেকে আসানসোল যেখানেই মোদী আসছেন সেখানে তিল ধারণের জায়গা থাকছে না। নরেন্দ্র মোদী নিজেই বলছেন, এত মানুষ নিয়ে সভা না করে রোড-শো করাই ভালো। আর সেই ভিড় দেখে দিদি যে কী চিন্তিত সেটা বোঝা যাচ্ছে দিনে তিনটে, চারটে সভা করার পরেও তিনি হাঁটতে শুরু করছেন। যেখানে পারছেন হাঁটছেন। না, হাঁটা নয়, ওটাকে দৌড় বলা উচিত। যেন দৌড়ে দিল্লি যাবেন এমন ভাব।

উন্নয়ন ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে বিঁধে মোদী বলেন, "এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ আর দাদাগিরিতে টপ গিয়ার, আর উন্নয়নে স্পিড ব্রেকারের কাজ করছেন দিদি।" তিন দফা ভোটের পরেই মোদী ঘোষণা করে দিয়েছেন, "মমতা দিদির পায়ের তলা থেকে জমি সরে গেছে। ওনার সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আর সেটা উনি নিজেও বুঝতে পারছেন। টিএমসি-র অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে মিটিংয়ে লোক হচ্ছে না। তার জন্য বাংলাদেশ থেকে অভিনেতা আনতে হচ্ছে। খুব মায়া হয় দিদি আপনার জন্য, খুব মায়া হয়। দিদি আপনার এ কী অবস্থা করে দিল বাঙ্গলার বীর জনতা?" অনুব্রত মণ্ডলের জেলা বীরভূমে বিপুল সমাবেশ মোদী বলেন, "প্রথম তিন দফায় নির্বাচনের পরে রিপোর্ট বলছে, দিদির সূর্যাস্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। বাঙ্গলার ভালোবাসা আমায় নতুন শক্তি দিচ্ছে। আর দিদি যত মোদীকে নিয়ে বলবেন তত শক্তিশালী হবে বিজেপি।"

বীরভূমে সমাবেশ করতে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গও টানেন মোদী। অভিযোগ করেন, গুরুদেবের শান্তিনিকেতনকে অশান্ত করে রেখেছে তৃণমূলের গুন্ডারা। রাজ্যে সরস্বতী পুজো, দুর্গা পুজো, রামনবমী সবই ভয়ে ভয়ে পালন করতে হয়। ঘরবাড়ি তৈরি থেকে সব কাজে দিদির লোকেদের সিন্ডিকেটের কাছে হাত জোড় করতে হয়।

এমন বাঙ্গলার কল্পনা রবীন্দ্রনাথ করেননি। গুরুদেবের স্বপ্ন ছিল এমন সমাজ যেখানে কেউ মাথা নত করবে না। শুধু কি এটুকুই! মোদী তো চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের প্রচারে বার বার 'চৌকিদার' নাম নিয়ে কটাক্ষ করছেন। আর মোদীও প্রতিটি কথার শেষ সেই 'চৌকিদার' নামের উল্লেখ করেই চ্যালেঞ্জও ছুঁড়েছেন। তাঁর কথায়, ''পিসি-ভাইপোর খেলা বুঝে গিয়েছে বাঙ্গলা। দিদির বিরুদ্ধে শুধু মোদী নয়, গোটা বাঙ্গলা। তিন দফায় ভোট দেখে হতাশ দিদি। এখন তাঁর নীতি হচ্ছে, গুন্ডাদের জন্য মমতা, জনগণের জন্য নির্মমতা।''

রাজ্যে একটি সমাবেশ থেকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে চার হুঁশিয়ারি দেন মোদী। তিনি বলেন, কিছু বড়ো পদক্ষেপ নেওয়া হবে ২৩ মে-র পরে। 'চৌকিদার' ব্যবস্থা নেবেই।

১। চিটফান্ডের নামে যারা গরিবদের টাকা নিয়েছে তাদের ঠিক জায়গায় পাঠানো হবে। পাই পাই হিসেব দিতে হবে।

২। নেতা বা অফিসার যেই হও না কেন নারদা, সারদা আর রোজভ্যালিতে যুক্ত কাউকে ছাড়া হবে না।

৩। নাগরিকতা আইনের সংশোধনী বিল পাশ করানো হবেই। এনআরসি-র মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীর পরিচয় খুঁজে বের করা হবে।

৪। ধর্ম রক্ষার জন্য যাদের ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাদের নাগরিকতার পুরো সম্মান দেওয়া হবে।

এতো গেল হুঁশিয়ারি। কিন্তু মমতা যেসব প্রকল্প নিয়ে সাধারণ মানুষের মন গলাতে চাইছেন সেই বেলুনও ফাঁসিয়ে দিয়েছেন মোদী।

প্রথমে বলেছিলেন, 'স্পিড ব্রেকার দিদি।' পরে বলেছেন, 'স্টিকার দিদি'।

কেন স্টিকার দিদি বলছেন, তা ব্যাখ্যা করে মোদী বলেন, দিল্লি থেকে আমরা প্রকল্পের টাকা পাঠাই। দিদি সেই প্রকল্পের উপর স্টিকার মেরে দেন। এই যেমন গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র টাকা পাঠিয়েছে। বাঙ্গলায় ষাট লক্ষ পরিবার তার সুবিধা পেয়েছে। দিদি তাতে স্টিকার মেরেছেন। শুধু তা নয়, এই যে দিদি সস্তায় রেশন দেন (পড়ুন দু' টাকা কিলো চাল), সেই টাকাও কেন্দ্র দেয়। গরিবদের বাড়ি বানানোর জন্য টাকা, তাও কেন্দ্র দিচ্ছে। কিন্তু দিদি শুধু স্টিকার লাগায় আর তার উপরে তোলাবাজির ট্যাক্স আদায় করে। কেন্দ্র থেকে গরিবরা বাড়ি বানানোর জন্য যে টাকা পায়, তাতেও তৃণমূলের নেতারা বদমায়েশি করেন।

আসলে স্টিকার মারতে তৃণমূল সরকার ওস্তাদ। এটা সবারই জানা যে, কেন্দ্রের খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় দু'টাকা কেজি চাল প্রকল্পের জন্য দিল্লি ভরতুকি দেয়। সেই প্রকল্প গোড়া থেকেই খাদ্যসাথী নাম দিয়ে রাজ্যের বলে চালায় নবান্ন। স্টিকারের প্রসঙ্গ শেষ করেই মোদী হুংকার দিয়ে বলেন, ''বুয়া-ভাতিজার খেলা বাঙ্গলার মানুষ জেনে গিয়েছে। ওদের বিদায় আসন্ন।'' বাঙ্গলায় আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে মোদী রাজ্যে এসে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মমতাকে মানসম্মান দিয়েছিল। কিন্তু মমতা সরকার প্রতিদানে কী দিয়েছে? বাঙ্গলার পবিত্র মাটিকে রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছে ওরা। গুন্ডাদের জন্য মমতা দেখাচ্ছে, আর জনগণের জন্য নির্মমতা।

অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও তৃণমূল সরকারের তুলোধনা করেছেন মোদী। তাঁর কথায়, ২০০৫ সালে বামেরা যখন বাঙ্গলায় ক্ষমতায়, তখন অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করে সংসদে গিয়ে কাঁদতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন সেই তিনিই অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য উতলা। মানুষ এই তুষ্টিকরণের রাজনীতিও ধরে ফেলেছে। ২৩ মে-তেই বোঝা যাবে তৃণমূলকে পরিত্যাগ করা শুরু করেছে বাঙ্গলার মানুষ।

এই ভাবে একের পর এক আক্রমণ শানাচ্ছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। না, দিদি এসবের কোনওটারই উত্তর দেননি দিদি। বরং, প্রতিটি মঞ্চে উঠে ভুল উচ্চারণে হলেও নানা মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছেন মমতা দিদি। নিজেকে হিন্দু প্রমাণের কী আপ্রাণ চেষ্টা! কিন্তু তাতে কী কাজ হবে?

সুন্দর মৌলিক

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

রম্যরচনা

শ্রেষ্ঠ কৌতুক

অটলবিহারী বাজপেয়ী, এপিজে আব্দুল কালাম এবং নরেন্দ্র মোদী প্রমাণ করেছেন যে, জীবনে যদি স্ত্রীর উৎপাত না থাকে তবে যেকোনো কবি, বিজ্ঞানী অথবা ফুটপাতের চা বিক্রেতা পুরো জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে!

অন্যদিকে মায়াবতী, মমতা এবং জয়ললিতা প্রমাণ করেছেন যে, জীবনে যদি স্বামীর উৎপাত না থাকে তবে একজন নারী পুরো দেশকে উৎপাতে ভরিয়ে দিতে পারে!

* * *

বিজেপি চাণক্য

আড়াই হাজার বছর আগে চাণক্য বলেছিলেন, যখন দেশের চোর-ডাকাতরা রাজার বিরুদ্ধে চিৎকার করতে শুরু করবে, তখন বুঝতে হবে রাজা ঠিক কাজ করছেন ও দেশ এগিয়ে চলেছে।

চাণক্য পণ্ডিত কি বিজেপি করতেন!



উবাচ



"মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় থাকলে পশ্চিমবঙ্গ জম্মু-কাশ্মীর হয়ে যাবে। এটা শুধুমাত্র তাঁর তোষণনীতির জন্য। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে যে আই এস হুমকি এসেছে এটি তার প্রমাণ"

কৈলাস বিজয়বর্গীয়
বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে আইএসের হুমকি প্রসঙ্গে



"দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেই মুসলমান মহিলারা কোনো ধরনের মুখঢাকা পোশাক পরতে পারবেন না। এতে মানুষের পরিচিতি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।"

মৈত্রীপালা সিরিসেনা
শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট

ইস্টারে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে



"পশ্চিমবঙ্গে রামনবমীর শোভাযাত্রা ভয়ে ভয়ে করতে হয়। সরস্বতী পুজো এখানে ভয়ে ভয়ে করতে হয়। এখানকার ভক্তদের বোমা-বন্দুকের ভয়ে থাকতে হয়।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ায় নির্বাচনী বক্তব্যে



"পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করছে তৃণমূলের গুন্ডারা। সেখানে সরকার ও প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিজেদের কবজায় নিয়ে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ওই রাজ্যে তারা একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা চালাচ্ছে।"

মুখতার আব্বাস নকভি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ



"সাধ্বী প্রজ্ঞা নির্বাচনে লড়ছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি তাকে মহান সন্ত ও দেশভক্ত মনে করি।"

উমা ভারতী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

সাধ্বী প্রজ্ঞার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রসঙ্গে

ড. শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে হিন্দু বাঙ্গালির বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গ

বিনয়ভূষণ দাশ

উনিশশো সাতচল্লিশে স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশভাগ আর বঙ্গবিভাগ বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালির ইতিহাসে সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের অনিবার্য পরিণতি হলো এই বঙ্গবিভাগ। হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে এইভাবে আড়াআড়ি ভাবে বঙ্গভাগ বাঙ্গালির জীবনে এক নতুন সংকটের জন্ম যেমন দিয়েছে। সেই সঙ্গে নতুন ভাবে এই বাঙ্গলাকে বোঝা ও জানারও সুযোগ এনে দিয়েছে। বিভাগপূর্ব ভারতে বঙ্গবিভাগের আলাদা তাৎপর্য থাকলেও শেষ বিচারে বঙ্গবিভাগও কিন্তু হয়েছে সেই দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই।

সাধারণ্যে এই কথা চালু আছে যে, ইংরেজদের 'বিভাজন করে শাসন' করার নীতির মধ্যেই নিহিত আছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বীজ! কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনের অনেক আগে থেকেই বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল। হয়তো তার বহিঃপ্রকাশ সবসময় হতো না। কিন্তু তার একটা অন্তঃসলিলা প্রবাহ যে ছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও তাই কোনও অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের চেতনায় ছিল দুস্তর ব্যবধান। তারা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারেনি। ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান আগমনের সময় থেকেই এই ব্যবধান তৈরি হয়েছে; পারস্পরিক অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব এসব শুরু থেকেই ছিল। ইতিহাস একটু ঘাটলেই সেটা বোঝা যায়। সুলতানি আমলে বহিরাগত মুসলমান শাসকরা বাঙ্গলায় অনুপ্রবেশ করে রাজত্ব করলেও এদেশের বাসিন্দা, হিন্দু বাঙ্গালি তাঁদের মেনে নিয়েছিল; তাঁদের অধীনে কাজ করেছিল। হোসেন শাহকে হিন্দু বাঙ্গালি কবি 'গৌড়েশ্বর' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। মুসলমান শাসকদের হিন্দুরা মেনে নিয়েই নিজেদের চালিত করেছে। কিন্তু মুসলমান সুলতানি যুগে যখন রাজা গণেশ বাঙ্গলার রাজা হলেন তখন কিন্তু মুসলমানরা তাঁকে মেনে নিলেন না, তাঁর প্রজাহিতৈষী কার্যকলাপ সত্ত্বেও।

কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক অবধি বাঙ্গলা ছিল বহিরাগত মুসলমান অধিকারে। তারই মধ্যে রাজা গণেশ নিজের যোগ্যতায় বাঙ্গলার রাজপদে আরোহণ করেন। একক কৃতিত্বের দিক থেকে রাজা গণেশের তুলনা খুব কম শাসকের সঙ্গেই করা যায়। সুলতানি যুগে এই একজন হিন্দুর পক্ষেই সমগ্র বাঙ্গলায় শাসন করা সম্ভব হয়েছিল। সুলতানি যুগে এই প্রথম কোনো হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা একান্তভাবেই বাংলাদেশের, বাঙ্গালির শাসন। ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছেন, ''এর আগে যে সমস্ত মুসলমান সুলতান এদেশে রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের পিতৃভূমি ছিল বাইরে। তাঁরা নিজেরাও বাঙ্গলাকে নিজেদের স্বদেশ বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু বাঙ্গালি রাজা গণেশ যেদিন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন, সেদিন থেকে বাঙ্গলার রাজশক্তির সঙ্গে বাঙ্গলার জনসাধারণের অন্তরের যোগ স্থাপিত হলো।'' কিন্তু মুসলমানেরা রাজা গণেশকে মেনে নিতে পারল না। তাঁরা নানাভাবে গণেশকে উত্যক্ত করতে লাগল। রাজা গণেশ রাজদরবারে আসীন অবস্থায় বদর-উল-ইসলাম তাঁকে অভিবাদন না করে অসম্মান করে। এতে তিনি ওই দরবেশ ও কয়েকজন উলেমাকে শাস্তি দেন। দরবেশদের নেতা নূর কুতব আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শারকিকে চিঠি লিখে বাঙ্গলা আক্রমণ করে, রাজা গণেশকে নিহত করতে আবেদন করে। জৌনপুরের আরেক দরবেশ আশরাফ সিমনানিও তাদের সাহায্য করে। আবার নবাবি আমলে, আজিমুস্বানের আমলে রাজা সীতারাম রায় স্বাধীনভাবে ভূষণায় রাজত্ব শুরু করলে তাঁকেও নবাবের দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ সহ্য করতে পারেনি। অন্য জমিদারদের বাধ্য করে তাঁকে সাহায্য করতে এবং তাঁদের সাহায্য নিয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজা সীতারামের পতন ঘটায়। এমন আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব শুরু থেকেই ছিল। এই দ্বন্দ্বের পেছনে ইংরেজদের 'হাত' খোঁজা তাই এক বাতুলতা।

স্বাধীনতার সময়ে সাধারণ বাঙ্গালি হিন্দুরা কোনো অখণ্ড, স্বাধীন, সার্বভৌম বাঙ্গলার স্বপ্ন দেখেনি। তাঁরা ভারতবিচ্ছিন্ন কোনও বাঙ্গলার কথাও ভাবেননি, তাঁরা অখণ্ড ভারতের উত্তরাধিকারই চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশভাগ ও স্বাধীনতার প্রাক্কালে হঠাৎই তাঁরা শুনল, কয়েকজন নেতা স্বাধীন সার্বভৌম, অখণ্ড বাঙ্গলার স্বপ্ন ফেরি করতে শুরু করেছে। বাঙ্গলাকে অখণ্ড রেখে স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি দেশ হিসেবে গঠন করার একটা প্রস্তাব করেছিলেন বাঙ্গলার তিন প্রভাবশালী নেতা। এঁরা হলেন, হাসান শাহিদ সোহরাওয়ার্দি, লিগ নেতা আবুল হাশিম এবং শরৎচন্দ্র বসু। পরে এঁদের সঙ্গে যুক্ত হন কিরণশঙ্কর রায় এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। যদিও শেষোক্ত দুজন পরে এই পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে কলকাতা নরসংহারের কুখ্যাত নায়ক সোহরাওয়ার্দি সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করতেন। তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা না ছিল তাঁর নিজের দল মুসলিম লিগের কাছে, না ছিল হিন্দুদের কাছে। গভর্নর-জেনারেল মাউন্টব্যাটেন এবং বাঙ্গলার গভর্নর বারোজ দুজনেই তাঁকে সন্দেহ করতেন। প্রায় দুশো বছরের ইংরাজ শাসনে ইংরেজদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও মুসলমানরা বিশেষ উন্নতি করতে পারেনি; কিন্তু দেশের শাসনের উপর কর্তৃত্ব করবার ইচ্ছে তাঁদের ষোলো আনা ছিল।

আর ইচ্ছে ছিল হিন্দুদের উপর কর্তৃত্ব করা ও তাঁদের উপর দমন-পীড়ন চালানো। বাঙ্গলায় সোহরাওয়ার্দির প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে তাঁরা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্টকে Day of Deliverance বা 'পরিত্রাণ দিবস' ঘোষণা করে কলকাতার হিন্দুদের উপর ব্যাপক আক্রমণ ও অত্যাচার শুরু করে; এটা হয়তো মুসলিম লিগের নেতা ও গুন্ডাদের একটা পরীক্ষামূলক অভিযান ছিল। কিন্তু এই দাঙ্গার বীভৎসতা হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে এক দুরপনেয় সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি করে দেয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় হিন্দুদের এই বোধ হয় যে, মুসলমানদের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করা সম্ভব নয়। এই ঐতিহাসিক সত্য তাঁরা ভুলতে পারেনি। মুসলিম লিগ এবং জিন্নাহ চেয়েছিল সমগ্র বাঙ্গলাকেই তাঁর প্রস্তাবিত পাকিস্তানে নিয়ে আসতে; এ ব্যাপারে বাঙ্গলায় তাঁর সহায়ক ছিল সোহরাওয়ার্দি। সুতরাং যখন জিন্নাহ পাকিস্তান আদায়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন তখন তাঁর দোসর সোহরাওয়ার্দি মুসলিম লিগের 'প্রক্সি প্ল্যান' 'Independent, Undivided, United Sovereign Bengal' বা 'অখণ্ড, স্বাধীন, সার্বভৌম বাঙ্গলার' প্রস্তাব নিয়ে এলেন।

এমত অবস্থায় তৎপর হয়ে উঠলেন বাংলার হিন্দু নেতারা। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তো ছিলেনই, সঙ্গে পেলেন হিন্দু মহাসভার নেতা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সনৎ কুমার রায়চৌধুরী, সূর্যকুমার বসু এন সি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিকে। বাস্তবে ১৯৪৬-এর নরসংহারের সময়েই মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করবার জন্যই হিন্দু মহাসভা এই দাবি উত্থাপন করে। আর সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে লিগ মন্ত্রীসভা নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়াতেই হিন্দুদের মধ্যে এই দাবির প্রতি সমর্থন ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়। এই প্রেরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার তিনদিনের সম্মেলন শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, হিন্দু মহাসভা ভারতের মধ্যেই দুটি রাজ্য—হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গ এবং মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গ চেয়েছিল। তাঁরা ভারতভাগ চাননি। মহাসভার ওই সম্মেলনে ৫ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ভাষণে বললেন, ''I can conceive of no other solution of the communal problem in Bengal than to divide the province and let the two major communities residing herein live in peace and freedom.'' শ্যামাপ্রসাদের এই বক্তব্যে কোনো সাম্প্রদায়িক সুর ছিল না। বরং, কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গার মাধ্যমে মুসলিম লিগ প্রস্তাবিত পাকিস্তান হিন্দুদের কাছে কেমন হতে পারে তার একটা আস্বাদ দেবার যে চেষ্টা করেছিল তা থেকে হিন্দুদের মুক্তি দেবার চেষ্টা ছিল এই প্রস্তাবে। হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের একই দিনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৪ এপ্রিলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় 'বঙ্গবিভাগের' প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ড. পি এন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার দেবেন্দ্রলাল খান, মাখনলাল সেন ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত। শ্যামাপ্রসাদ বঙ্গীয় কংগ্রেসের 'বঙ্গ বিভাজন' প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। এরপরে, ২২ এপ্রিল নতুন দিল্লির এক জনসভায় শ্যামাপ্রসাদ বলেন, ''This separation must not be dependent on Pakistan. Even if Pakistan is not conceded and some form of a weak and loose centre envisaged in the Cabinet Mission Scheme is accepted by the Muslim League, we shall demand the creation of a new province composed of the Hindu majority areas in Bengal. এখানে স্মর্তব্য যে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব, পি এন সিংহরায়, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, মহারাজকুমার শীতাংশুকান্ত আচার্যচৌধুরী, মহারাজা প্রবেন্দ্রমোহন ঠাকুর, অমরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বঙ্গবিভাগ সমর্থন করেন।

এছাড়া শ্যামাপ্রসাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন বাঙ্গলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা। ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিকদ্বয় ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ও স্যার যদুনাথ সরকার, পণ্ডিত রামশঙ্কর ত্রিপাঠী, ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী, বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাদ সাহা ও ড. এ মিত্র প্রমুখ ড. শ্যামাপ্রসাদের মত সমর্থন করলেন। শনিবারের চিঠিতে সম্পাদক সজনীকান্ত দাস লিখলেন, 'পৃথক হইয়া যাওয়াই ভালো।' জিন্নাহ যে যুক্তিতে ভারতভাগ করতে চেয়েছিলেন সেই যুক্তিতেই শ্যামাপ্রসাদও বাঙ্গলাকে বিভক্ত করতে চেয়েছিলেন। ফলে কংগ্রেস এর বিরোধিতা করার যুক্তি খুঁজে পায়নি। কিন্তু সোহরাওয়ার্দি ও জিন্নাহ তাঁদের হতাশা গোপন করতে পারেননি। জিন্নাহ গভর্নর-জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের কাছে আবেদন জানালেন, 'Please do not give me moth-eaten Pakistan.' কিন্তু জিন্নাহও শেষ অবধি অখণ্ড বাঙ্গলা প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান, কারণ তার অভিসন্ধি ছিল, '...an independent Bengal would be a sort of Subsidiary Pakistan...' এর অব্যবহিত পরে বাঙ্গলাভাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক বাগবিতণ্ডা হয়েছে, তর্কবিতর্ক হয়েছে আর ড. শ্যামাপ্রসাদ অতন্দ্র প্রহরীর মতো সতর্ক থেকে সেদিকে নজর রেখেছেন।

এছাড়া এই সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকা এক জনমত সমীক্ষার আয়োজন করে যাতে ৯৮ শতাংশের বেশি হিন্দু বঙ্গ বিভাজনের পক্ষে রায় দেন। শেষে ড. শ্যামাপ্রসাদ গভর্নর-জেনারেল মাউন্টব্যাটেনেকে ১৯৪৭-এর ২ মে ৯ দফা যুক্তি দেখিয়ে আবেদন করে 'বঙ্গ বিভাজন' এর প্রস্তাব কার্যকর করতে আহ্বান জানান। সুতরাং বাঙ্গলাকে ভাগ করে হিন্দু বাঙ্গালির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁর। যদি অখণ্ড ভারতে হিন্দু-মুসলমান একত্রে মিলেমিশে না থাকতে পারে তাহলে অখণ্ড বাঙ্গলায়ও তাঁরা একত্রে মিলেমিশে থাকতে পারবে না; তিনি তাই চেয়েছিলেন বাঙ্গলাকে ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করতে। তাঁর ওই আবেদনের একমাস পরে ২ জুন, ১৯৪৭ বাঙ্গলা বিভাজন এবং দেশভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ড. শ্যামাপ্রসাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও তাঁর সমর্থক ও বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে গড়ে উঠে হিন্দু বাঙ্গালির বাসস্থান, 'পশ্চিমবঙ্গ'। ভারতের সংসদে দাঁড়িয়ে শ্যামাপ্রসাদ জওহরলাল নেহরুকে বলেছিলেন, 'You have divided India, I have divided Pakistan.'। ■

কান মলছি ধর্মাবতার এমন কাজ আর কখনও করব না



কী গেরো বল দেখি ভাই! এমন বিপদে আগে কখনও পড়িনি। ভেবেছিলাম ভোটের আগে নরেন্দ্র মোদীর ইমেজের তেরোটা বাজিয়ে ছাড়ব। ব্যাস, স্লোগান দিলুম, চৌকিদার চোর হ্যায়। মিডিয়া আমার সঙ্গে গলা মেলালো বটে কিন্তু তাতে চিড়ে ভিজল না। যাদের জন্য বলা তারা বলল, রাফাল কী? রাফাল কি কোনও পাখির নাম? বোঝ কাণ্ড! রাফাল কী জানেই না! আমেরিকার কনসালট্যান্ট কোম্পানি বলল, এভাবে হবে না। আরও বড়ো মুরুব্বি ধরুন। কাকে ধরব রে ভাই! সবাই তো আড়ালে আমাকে পাপ্পু-ফাপ্পু বলে যা তা খিল্লি করছে। তাই তো বাধ্য হয়ে সুপ্রিম কোর্টকে জড়ালুম। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবে কে জানত! আমি গান্ধী ফ্যামিলির ছেলে। এ দেশে মৌর্য, গুপ্ত আর মুঘলের পর এত শক্তিশালী ডাইন্যাস্টি আর আসেনি। সেই আমাকেই কিনা আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে হলো, ভুল হয়ে গেছে ধর্মাবতার! এমন কাজ আর কখনও করব না।

অথচ বল ভাই, আমি কি একা মিথ্যে কথা বলেছি? অখিলেশ মায়াবতী মমতা— সবাই তো বলে। অখিলেশ মায়াবতীর অবস্থা এতটাই করুণ, ওদের সমর্থক দেখলেই ষাঁড়ে তাড়া করছে। কোথা থেকে এত ষাঁড় এল কে জানে! আর মমতার কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। প্রায় প্রত্যেক সভাতেই অসংলগ্ন কথা বলছে। কখনও বলছে, বাচ্চার ওজন সতেরোশো পাউন্ড না হলে নাকি সেই বাচ্চা সুস্থ নয়। কখনও বলছে, আমি বারাণসীতে দাঁড়ালে মোদী একটা ভোটও পেত না। ফেসবুকে একজন পোস্ট করেছে, মমতা নাকি ইচ্ছে করেই এরকম করছে। সারদা কাণ্ডে ধরা পড়লে যাতে নিজেকে মানসিক রোগী বলে চালানো যায়। এসব অবশ্য অপরিণত বালক-বালিকাদের কথা। বিজেপির ষড়যন্ত্রও হতে পারে।

বাজে কথা অনেক হলো। এবার একটা কাজের কথা বলি। এই তোর কাছে কান মলছি ভাই। এমন কাজ আর কখনও করব না। অন্তত আদালতকে জড়িয়ে মিথ্যে কথা বলব না। উচিত শিক্ষা হয়েছে আমার। ভালো থাকিস। ইতি— ■

শীর্ষ আদালতে নতমস্তক রাহুল গান্ধী ক্ষমা চান মোদীজীর কাছেও

সনাতন রায়

কথায় বলে— অতি চালাকের গলায় দড়ি।

কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর অবস্থা হয়েছে তাই। রাজনীতিতে অকালপক্ক নেহরু-গান্ধী পরিবারের রাজনৈতিক পরিবারতন্ত্রের পুরস্কার এই 'পাপ্পু' গান্ধী ভারতীয় রাজনীতি তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ময়দানের তুখোড় খেলোয়াড় নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর সঙ্গে পাঙ্গা দিতে গিয়ে একেবারে ল্যাজে-গোবরে নাস্তানাবুদ হয়ে গেলেন। অবস্থা এমনই যে শুধু জেদ বজায় রাখার জন্য মাঝেমধ্যে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে স্লোগান তুলছেন— 'চৌকিদার চোর হ্যায়।'

হ্যাঁ যত কাণ্ড ওই 'চৌকিদার চোর হ্যায়' স্লোগানটিকে ঘিরেই। কংগ্রেস সভাপতি ওই স্লোগানটিকে মূলধন করেই এবারের লোকসভা ভোটে ঝাঁপিয়েছিলেন এবং স্বীকার করতে বাধা নেই, স্লোগানটি বেশ জনপ্রিয়ই হয়েছিল 'চ' এর অনুপ্রাসের জোরে। কিন্তু ওই 'চ' এর অনুপ্রাসে অনুপ্রাণিত স্লোগানটির জন্যই ভারতবর্ষের শীর্ষ আদালতের শীর্ষতম বিচারকের কাছেই তাঁকে 'চড়' খেতে হবে, তা তিনি নিজেও বোঝেননি। এখন দু' হাত জোড় করে আদালতের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। প্রকারান্তরে ক্ষমা চাইছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছেই, কারণ রাহুল গান্ধীর আবিষ্কৃত 'চোর চৌকিদার' অভিযোগটি চাপানো হয়েছিল সম্মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর ওপরই।

ঘটনাটা একটু খুলেই বলা যাক। এবার লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের মোক্ষম অস্ত্র হলো 'রাফাল যুদ্ধবিমান দুর্নীতি'। রাহুল গান্ধী অভিযোগ তুলেছিলেন, রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে রীতিমতো বড়ো মাপের দুর্নীতি হয়েছে এবং কোটি কোটি টাকার এই দুর্নীতিতে সরাসরি জড়িত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার অনেক আগে থেকেই রাহুল গান্ধী নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার হাল হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন এই রাফাল দুর্নীতিকে এবং এটিকেই পাখির চোখ করে তিনি নরেন্দ্র মোদীকে 'চোর' প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কারণ মোদীজীর পাঁচ বছরের প্রশাসনে ভারতবর্ষে যে 'নয়া প্রশাসনের' অভিজ্ঞতা মানুষ সঞ্চয় করেছে, তার সঙ্গে লড়তে গেলে সত্যি বা মিথ্যে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা এবং বাজার গরম করা ছাড়া যে নান্যপন্থা অয়নায় --- তা বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি।

কিন্তু বিধি বাম। যে দুর্নীতি হয়ইনি, তাকে প্রমাণ করবেন কীভাবে? অতএব সুপ্রিম কোর্টের প্রাথমিক নিরীক্ষণেই প্রমাণ হয়ে গেল, রাহুল গান্ধীর অভিযোগ নিতান্তই নিম্নমানের একটি রাজনীতি। রাহুল গান্ধীর কাছে এটা ছিল একটা বড়ো ধাক্কা। কিন্তু প্রায় হারিয়ে ফেলা তুরুপের তাসটি রাহুলজীর হাতে ফিরে এল যখন বিভিন্ন নথি সহ একটি বহুল প্রকাশিত সংবাদপত্র প্রকাশ করল যে রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে।

অতএব খুব স্বাভাবিক নিয়মেই সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় রাফাল মামলাটি চালু করল এই কারণে যে তারা সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যাদি যাচাই করে দেখতে চান।

সুপ্রিম কোর্টের এই ঘোষণার পরেই রাহুল গান্ধী হাতে চাঁদ ফিরে পেলেন এবং পুনর্শক্তিতে বলীয়ান কংগ্রেস সভাপতি জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন--- তিনি যা বলেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টও তাই বলেছে— চৌকিদার চোর হ্যায়।

অতি উৎসাহী এবং অনভিজ্ঞ রাজনীতির ফল এটাই। বিজেপি সাংসদ মীনাক্ষী লেখি ছুটলেন আদালতে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ নিয়ে। কারণ সুপ্রিম কোর্ট রাফাল মামলার তথ্য যাচাই করবে বলে ঘোষণা করলেও, শীর্ষ আদালতে কখনই বলেননি, চৌকিদার চোর হ্যায়। অতএব আইনি জালে ফেঁসে গেলেন রাহুল গান্ধী। এবং সুপ্রিম কোর্ট আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করলেন রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে। বিপাকে রাহুল। হাতজোড় করে তাঁকে শীর্ষ আদালতে জানাতেই হলো— ''উত্তেজনার বশে বলে ফেলেছিলাম। ভেবেচিন্তে নয়। সুপ্রিম কোর্টকে কোনোভাবেই রাজনীতির মধ্যে আনতে চাই না। এর পরেও ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুপ্রিম কোর্ট যা রায় দেবে, তা মাথা পেতে নেব।''

সেই সঙ্গে আরও বলেছেন, ''আদালতে কোনও মামলায় নিজেদের সওয়ালের সপক্ষে রায় বা নির্দেশ হলে যে কোনো সাধারণ লোক যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেন, আমিও তাই দিয়েছিলাম ইচ্ছাকৃত বা ভেবেচিন্তে বলিনি। দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব হওয়ার পাশাপাশি ১৩০ বছরের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান হওয়ার সুবাদে আমার মন্তব্যের রাজনৈতিক ও আইনি কী ব্যাখ্যা হতে পারে, সর্বোচ্চ আদালত তা শুধরে দেওয়ায় কৃতজ্ঞ। আদালতের এই অবস্থান মাথা নত করে আমি স্বীকার করছি।''

হ্যাঁ মাথা নত করেছেন রাহুল গান্ধী। শুধু সুপ্রিম কোর্টের কাছেই নয়। এ নতিস্বীকার মোদীজীর কাছে, দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে। সর্বোপরি দেশের জনগণের কাছে, কারণ রাহুল গান্ধী মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলেন সেই মানুষটি সম্পর্কে যিনি ২০১৪ সালের ক্ষমতার তখতে বসেই প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে তাঁর চুরি করার দরকার নেই, কারণ তাঁর কোনও পরিবার নেই। বলেছিলেন, ''I am a detached person. I have no attachment.''

শেষ পর্যন্ত দেশের শীর্ষ আদালত কী পদক্ষেপ নেয় তার জন্য অপেক্ষমাণ দেশবাসী। কারণ শ্রীমতী মীনাক্ষী লোখি শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন করেছেন, রাহুল গান্ধী যা করেছেন তা জেনে শুনে ভেবেচিন্তেই করেছেন। আদালতের নির্দেশ না পড়ে এভাবে মন্তব্য করা দায়িত্বহীনতার পরিচয়। সুতরাং শীর্ষ আদালত এ ব্যাপারে যেন কড়া পদক্ষেপ নেন যাতে ভবিষ্যতে কোনো রাজনীতিবিদই এভাবে কোনো আদালতকেই অপমান করতে না পারে।

কিন্তু লজ্জার বিষয়, এত ঘটনার পরও রাহুল গান্ধী চিৎকার করে যাচ্ছেন— রাফাল দুর্নীতির অভিযোগ তিনি তুলে নিচ্ছেন না। কারণ দুর্নীতি তিনি প্রমাণ করবেনই। আসল ঘটনা হলো, এই একটি ইস্যুকেই তিনি মূলধন করেছেন এবারের নির্বাচনে। সেটা হাতছাড়া করলে তো পুরো নির্বাচনটাই জলে যাবে! অতএব শীর্ষ আদালতের কাছে মুণ্ডিত মস্তকে ক্ষমা চাইলেও তিনি ফের বেলতলায় যেতে রাজি। কারণ শাস্ত্রেই বলেছে— মরণকালে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়। রাহুল গান্ধীর তাই হয়েছে। গোটা দেশ যখন মোদী আবেগে ভাসছে, তখন কংগ্রেসের কাণ্ডারি হয়ে তিনি শুধু নিজেই ডুবছেন না, ডোবাচ্ছেন দেশের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেসকে। পরিবারতন্ত্রের বিপদ যে কী ভয়ানক এবার আশা করি তাবড় কংগ্রেস নেতৃত্ব তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী তো ঘোষণা করেই দিয়েছেন, রাহুল গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধীকে তিনি জেলে ঢুকিয়েই ছাড়বেন। কারণ তাঁরা দুজনেই খ্রিস্টান এবং তাঁরা দুজনেই একাধিক পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরে বেড়ান। তাঁর নথিসহ অভিযোগ, রাহুল গান্ধীর আসল নাম রল ভিঞ্চি (Raul Vinci) এবং সোনিয়া গান্ধীর আসল নাম আন্তোনিয়া মিয়ানো। শুধু তাই নয়, রল ভিঞ্চি নামে বিদেশি কালজে পড়াশুনা করার সময় রাহুল গান্ধী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণ বিষয়ে ফেল করেছিলেন। ফলে তিনি এম ফিল ডিগ্রিটি আর হস্তগত করতে পারেনি।

এহেন ভয়ংকর অভিযোগের মুখে



মরণকালে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়। রাহুল গান্ধীর তাই হয়েছে। গোটা দেশ যখন মোদী আবেগে ভাসছে, তখন কংগ্রেসের কাণ্ডারি হয়ে তিনি শুধু নিজেই ডুবছেন না, ডোবাচ্ছেন দেশের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেসকে।

দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধী এখনও নির্বাচনী সমাবেশে মোদীজীকে লাস্য করে বলে চলেছেন— 'চৌকিদার চোর হ্যায়।' এর থেকে ঘৃণ্য নির্লজ্জতা আর কী হতে পারে?

এই মুহূর্তে কংগ্রেস তথা দেশের আপামর কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দের সামনে সবচেয়ে বড়ো বিপদ দলীয় সভাপতি স্বয়ং। যদি সত্যি প্রমাণ হয়, রাহুল গান্ধী নাম ভাঁড়িয়ে বিদেশি পাসপোর্ট সংগ্রহ করেছিলেন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, যদি সত্যিই প্রকাশ্যে আসে যে তিনি জাল পাসপোর্টের এবং জাল শিক্ষাগত সার্টিফিকেট নিয়ে ঘুরছেন, সেদিন তো গাটা দলটাই তাসের ঘরের মতো উড়ে যাবে জনরোষের ঝড়ে।

শুধু রাহুল গান্ধীই নয়, সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করেছেন কংগ্রেসের সদস্যা প্রাক্তন সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধেও। তাঁর অভিযোগ ২০১৪ সালে নির্বাচনী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেশ করার সময় তিনি তাঁর সম্পত্তির বিষয়ে মিথ্যা তথ্য পেশ করেছিলেন। এমনকী টাইমস অব ইন্ডিয়াতেও একবার প্রকাশিত হয়েছিল, ইতালিতে তাদের ২৩,২০,১১০ টাকার সম্পত্তি আছে এবং দিল্লির দারামন্দি গ্রামে সোনিয়া গান্ধীর যে জমি আছে তার আর্থিক মূল্য ৭,২৯,৬১,৭৯৩ টাকা।

কংগ্রেস বরাবর পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি করে এসেছে। দল নয়, কংগ্রেসের কাছে সবচেয়ে বড়ো নেহরু-গান্ধী পরিবার। তার ফল এসব অভিযোগ। তার ফল দলের এই সব অধঃপতনের লক্ষণ সমূহ।

এখন রীতিমতো ঝড়ের মুখে কংগ্রেস। একদিকে মোদী ঝড়। অন্যদিকে কংগ্রেসের ভুলের ঝড়। গোটা দলটাই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবার মুখে। ঠিক এইভাবেই ভারতবর্ষের একদা বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠনটির সাংসদ-শক্তি ২০১৪-তে এসে ঠেকেছিল ৪৪-এ। এবার হয়তো আরও কমবে। কমতেই থাকবে যতদিন না কংগ্রেস নেহরু- গান্ধী পরিবার-প্রীতি থেকে মুক্ত হচ্ছে। যতদিন না কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর আইকন তথা ব্র্যান্ড লোগো থেকে মুক্ত হচ্ছে। যতদিন না কংগ্রেস বুঝতে পারছে, ভারতীয় রাজনীতিতে বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবর্তন আসছে। বস্তাপচা পারস্পরিক অভিযোগের অঙ্ক নিয়ে বিরোধী রাজনীতির পালে হাওয়া পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে আগে প্রয়োজন দলটির নিজেদের সংশোধন। তা না হলে অভিযোগকে মূলধন করে এগোতে গেলে পালটা অভিযোগের পাহাড় ভেঙে পড়বে কংগ্রেসের ওপরই। কারণ ৭২ বছরের পাপ— তার বোঝা তো কম নয়!

রাহুল গান্ধীজী— একটু ভাবুন। একটু বুঝুন। মাঝে মাঝে তো আপনি নিখোঁজ হয়ে যান। একবার হিমালয়ে যান। নিশ্চিন্তে ধ্যান করুন। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা করুন। দেখবেন, আর বলতেই ইচ্ছে করবে না— চৌকিদার চোর হ্যায়। বলতে ইচ্ছে করবে— চৌকিদার ভগবান হ্যায়। ■

রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব ও ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি
একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বিমল শঙ্কর নন্দ

কংগ্রেসের নেতৃত্বের ধরন কিংবা প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করলে কংগ্রেসের কিছু অত্যুৎসাহী সমর্থকের সমালোচনা সহ্য করতে হয়। এই সমালোচনার প্রধান বিষয় হলো কংগ্রেস কাকে তাদের সর্বোচ্চ নেতা বানাবে সেটা কংগ্রেসের নিজস্ব ব্যাপার এবং সেখানে অন্য কারোর কিছু বলার থাকতে পারে না। এটা একান্তই কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কোনো গুপ্তগোষ্ঠী নয়। বরং দেশের অন্যতম প্রধান সর্বভারতীয় দল। ১৩৪ বছরের পুরানো একটি রাজনৈতিক সংগঠন। সেই হিসাবে কংগ্রেস ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে এদেশে একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আছে। একাধিক অঙ্গরাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতার অধিষ্ঠিত। এদেশের কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষ লোকসভার নির্বাচনে অংশ নিয়ে দলটি কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরতে চায়। তাই কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা বা বিশ্লেষণের অধিকার সব মানুষেরই আছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকগুলি ধারার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা যে আবর্তিত এবং পরিচালিত হয়েছিল কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। যদিও দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার মদতপুষ্ট ঐতিহাসিকদের দিয়ে এই ধারাটিকেই একমাত্র ধারা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। কিন্তু সত্য হলো এই যে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ধারাটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কংগ্রেস কোনো দলও ছিল না সেই অর্থে। এটি দিল একটি ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন। অনেকটা প্ল্যাটফর্মের মতো যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী (এমনকী যদি তাদের পরস্পর বিরোধী মতাদর্শও থাকে) ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কংগ্রেস এভাবেই কাজ করেছে। যে কারণেই সংগঠনটির নাম কংগ্রেস। Congress, এই ইংরেজি শব্দটির মূল অর্থ ছিল— 'a formal meeting or a series of meetings'। এই নামে কোনো দল হয় না। স্বাধীনতার পরেও প্রশ্ন উঠেছিল কংগ্রেস সংগঠনটির অস্তিত্ব আর টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে কিনা। যাইহোক কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃত্ব একে একটি পুরোদস্তুর রাজনৈতিক দলে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেন। তাদের হয়তো মনে হয়েছিল কংগ্রেসের অবলুপ্তি ঘটালে ভারতের রাজনীতিতে একটি শূন্যতা দেখা দিতে পারে। সমস্যা দেখা দিত কিনা সেটা কল্পনার বিষয়। কিন্তু এটা সত্য যে সে সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত নেতারা ক্ষমতা লাভের জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন। ফলে কেবল ক্ষমতালাভের প্রয়োজনে কোনো সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ ব্যাতিরেকে গড়ে উঠল একটি রাজনৈতিক দল। দলটির সমস্যার বীজ কিন্তু এর মধ্যেই নিহিত। সাধারণভাবে উদারনীতিকে কংগ্রেস আদর্শ হিসেবে মানলেও, এ সম্পর্কে কংগ্রেসকর্মীদের একটা বড়ো অংশের স্বচ্ছ ধারণা আছে বলে মনে হয় না।



সাধারণভাবে কংগ্রেসকর্মীরা ক্ষমতার বাইরে থাকতে পছন্দ করে না। অর্থাৎ ক্ষমতা হলো অনেকটা সুতোর মতো যা বিভিন্ন অংশকে বেঁধে রাখে। ১৮৬৬ সালের ১১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর পর ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলে কংগ্রেসে এক নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। সেটা হলো সরকার এবং সংগঠন উভয়ের ক্ষমতা একজনের বা একটি পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া। ১৯৬৬ সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রয়াণের পর কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃত্ব (যেমন অতুল্য ঘোষ, নিজলিঙ্গাপ্পা, কামরাজ প্রমুখ) স্বাধীনচেতা স্বভাবের মোরারজী দেশাইকে ক্ষমতায় না বসিয়ে 'গুসি গুড়িয়া' ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন এই আশায় যে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালিত হবে দলের নির্দেশে। কিছুদিনের জন্য কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ করলেও ১৯৬৯ সালে ইন্দিরা দলটিকে তৈরি করলেন তাঁর মতো করে। একই ব্যক্তির হাতে সরকারি প্রশাসন এবং দলীয় নেতৃত্ব চলে এল। এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়করা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই একনায়কের মতো আচরণ করতে থাকেন। দলের অন্য সবাইকে সন্দেহ করতে থাকেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং নেতৃত্বের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে। নির্ভর করতে থাকেন ঘনিষ্ঠজনদের উপর। ইন্দিরা নির্ভর করতেন তাঁর কনিষ্ঠপুত্র সঞ্জয় গান্ধীর উপর। ১৯৮০ সালের ২৩ জুন এক বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধী নিহত হলে তাঁর স্থান পূর্ণ করতে আনা হলো জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীব গান্ধীকে। ভারতে চালু হয়ে গেল এক অতি কুৎসিত পরিবারতন্ত্র। এখন কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই হলো এই যে পরিবারের বাইরে কারোর পক্ষে শীর্ষ নেতৃত্বে আরোহণ করা

অসম্ভব। পরিবারেরই কেউ হবেন সমস্ত ক্ষমতার মালিক। তাঁর প্রতি শর্তহীন আনুগত্যই সাংগঠনিক কাঠামোতে সাফল্যের চাবিকাঠি। একবারই (১৯৯১-১৯৯৬) গান্ধী পরিবারের বাইরে পিভি নরসীমা রাওয়ের হাতে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ছিল। একথা অধিকাংশ মানুষই স্বীকার করেন যে মাত্র পাঁচ বছরের সময়কালে নরসীমা রাও রাষ্ট্রপরিচালনা এবং সুদূরপ্রসারী নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারের নিয়ন্ত্রণে থাকতে অত্যন্ত কংগ্রেস নেতা কর্মীদের এক অংশ নরসীমা রাওয়ের নেতৃত্বে মানতে চাননি। অর্জুন সিংহের মতো পরিবার অনুগতরা বার বার বিদ্রোহ করেছেন। অর্জুন সিংহকে দল থেকে বহিষ্কার করেও নরসীমা রাও দলকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। আর পরিবারকে অবহেলা করে দল ও প্রশাসন চালানোর সাহস দেখানোর মূল্য জীবনকালে না হলেও মৃত্যুর পর দিতে হয়েছিল নরসীমা রাওকে। তাঁর মৃতদেহটিকেও কংগ্রেস দপ্তরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

সংগঠনে পরিবারতন্ত্রের প্রবহমানতার সাম্প্রতিক সংযোজন রাহুল গান্ধী। সোনিয়া গান্ধীর পর দলের শীর্ষ নেতৃত্বে রাহুল গান্ধীকে অধিষ্ঠিত করতে প্রথমে তাঁকে দলের সহ-সভাপতি করা হলো ২০১৩ সালে, যদিও কংগ্রেসের দলীয় সংবিধানে এই ধরনের কোনো পদই নেই। পদটি তৈরিই হয়েছিল রাহুল গান্ধীকে সংগঠনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়ে নিয়ে আসতে। ২০১৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে রাহুল গান্ধী প্রত্যাশামতোই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। রাহুল গান্ধী সভাপতি হওয়ার পর গান্ধী পরিবারের চাটুকারিতায় সিদ্ধহস্ত কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার মন্তব্য করেছিলেন 'সম্রাটের সন্তান তো সম্রাট হবেই'। খাঁটি কথা!

একটি ব্যাপারে রাহুল গান্ধী বাস্তববাদী। তিনি বোঝেন যে ২০১৯-এ কেন্দ্রে দলকে ক্ষমতায় আনতে না পারলে সমূহ বিপদ। নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। তাতে পরিবারের

রাহুল গান্ধী অতি দ্রুত ক্ষমতায় আসতে চান। একটি দলের নেতা হিসেবে দলকে ক্ষমতায় আনার চেষ্টার মধ্যে অন্যায়ের কিছু নেই। কিন্তু তাঁর অতি হঠকারিতা দলকে ক্ষমতায় আনার বদলে বিস্মৃতির অতলে পাঠিয়ে দিতে পারে। ইতিমধ্যে সেই লক্ষণগুলি স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

অপ্রতিহত কর্তৃত্বের সামনে বিপদ আসতে পারে। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক চাটুকারিতা'র (competetitire psychophancy) আবহে বাস করা পরিবার তাহলে বিপদগ্রস্ত হবে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার মতো তেমন ইসুও নেই।আর গণআন্দোলন গড়ে তোলার কোনো মানসিকতাও কংগ্রেস নেতৃত্বের নেই। তাই অনেক ভেবে বের করা হয়েছে রাফাল ইসু।, সেহেতু চুক্তিটি দুটি দেশের মধ্যে এবং যুদ্ধবিমানগুলিকে অত্যন্ত গোপীনয়তার সঙ্গে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করা হবে। সুতরাং রহস্য সৃষ্টির এটাই সেরা পন্থা। দিকে দিকে রাহুলের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কর্মীদের গলা ফাটানো চিৎকার 'চৌকিদার চোর হ্যায়'। তাতেও খুব সুবিধা হচ্ছে না দেখে এবার দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্টকে নিয়েও টানাটানি শুরু হলো।

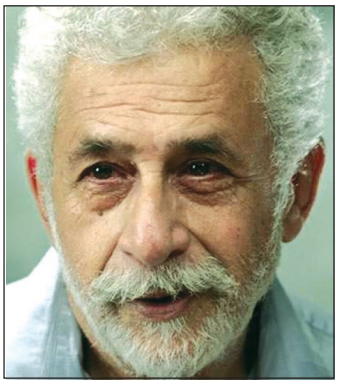
গত ১০ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেন যে প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে পাচার হওয়া নথিও রাফাল মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে গৃহীত হতে পারে। আনন্দের আতিশয্যে রাহুল গান্ধী দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বলে ফেললেন সুপ্রিম কোর্টও নাকি মেনে নিয়েছে চৌকিদার চোর হ্যায়। বিজেপি নেত্রী মীনাক্ষী লেখি বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ রাহুল গান্ধীকে জবাব দিতে বলেন। আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে গুলিয়ে ফেলার জন্য রাহুল দুঃখ প্রকাশ করলেও সুপ্রিম কোর্ট একেবারেই এই জবাবে সন্তুষ্ট হননি। কোর্ট রাহুলের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেছেন।

রাহুলের লক্ষ্য হলো রাফালকে কেন্দ্র করে বোফর্স ধাঁচের অবস্থা তৈরি করা। ১৯৮৭ সালে জনসাধারণের সামনে উন্মোচিত বোফর্স কেলেঙ্কারি ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে রাজীব গান্ধী সরকারের পতনের কারণ হয়েছিল। রাহুল সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চান। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। কারণ বোফর্স কেলেঙ্কারিতে কোর্ট রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রমাণ না পেলেও বহু প্রশ্নের উত্তর আজও মেলেনি; কি করে অট্টাভিও কাত্রোচ্চি সিবিআইয়ের জেরা এড়াতে ভারত ছাড়তে পারল? পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাধন সিংহ সোলাঙ্কি সুইডেন সফরকালে সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বোফর্স তদন্ত বন্ধ করতে চিঠি দিয়ে এসেছিলেন কেন? বোফর্স মামলায় এফ আই আর করতে সিবিআই এতো দেরি করেছিল কেন? আর্জেন্টিনা থেকে কাত্রোচ্চিকে ভারতে প্রত্যার্পণের ব্যাপারে এত দুর্বল মামলা সাজানো হয়েছিল কেন? কাত্রোচ্চির বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড করার নোটিশ তুলে নেওয়া হয়েছিল কেন? ইউপিএ আসলে কাত্রোচ্চির লন্ডনের এক ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলতে ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করা হয়েছিল কেন? এমন বহু প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। আর ২০১৩ সালের ১৩ জুলাই অক্টাভিও কাত্রোচ্চির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সত্য জানার সমস্ত সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেছে।

রাহুল গান্ধী অতি দ্রুত ক্ষমতায় আসতে চান। একটি দলের নেতা হিসেবে দলকে ক্ষমতায় আনার চেষ্টার মধ্যে অন্যায়ের কিছু নেই। কিন্তু তাঁর অতি হঠকারিতা দলকে ক্ষমতায় আনার বদলে বিস্মৃতির অতলে পাঠিয়ে দিতে পারে। ইতিমধ্যে সেই লক্ষণগুলি স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। ■

রাজনীতির ভোটরঙ্গে আঁতেলের কুরঙ্গ

সন্দীপ চক্রবর্তী



কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একটি কবিতায় লিখেছিলেন, 'আমার ভেতরে কোনও দল নেই। এই সময়ের কবি শিল্পী এবং সিনেমা ও নাট্যজগতের কুশীলবদের প্রগাঢ় রাজনীতিমনস্কতার প্রেক্ষিতে কথাটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ দল বলতে আমরা সাধারণভাবে আজকাল রাজনৈতিক দল বুঝি। একজন কবি যদি কোনও বিশেষ রাজনীতির পক্ষপাতী হন তাহলে তিনি বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় অন্য অনেক রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান। পরোক্ষত তার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নন এমন বহু মানুষের থেকেই তাকে দূরে সরে যেতে হয়।

কিছুদিন আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছ'শো নাট্যশিল্পী মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার চরম উদাহরণ পেশ করেছেন। সারা দেশে যখন নির্বাচন চলছে ঠিক তার প্রাক মুহূর্তে মানুষের কাছে তাদের আবেদন বিজেপিকে ভোট দেবেন না। কারণ গত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদী সরকার চরম অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি যদি আবার ক্ষমতায় আসেন তাহলে দেশে দলিত ও মুসলমানরা আর থাকতে পারবে না। দেশে গোরক্ষকদের তাণ্ডব বাড়বে। সুতরাং নরন্দ্রে মোদীকে একটি ভোটও নয়। নাট্যশিল্পীদের এই দলটির প্রধান মুখ ছিলেন নাসিরুদ্দিন শাহ, গিরিশ কারনাড, কঙ্কনা সেনশর্মা প্রমুখ।

প্রশ্ন হলো, এমন একটি আবেদন রেখে কীভাবে তারা মানুষের কাছ থেকে দুরে সরে গেলেন? হিন্দুরাই ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় ফিরলে দেশটা জনজাতি (সেকুলারদের ভাষায় দলিত) ও মুসলমানদের কাছে বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে— এমন বাক্যবন্ধের মানে দেশ শুধু হিন্দুদের বসবাসের যোগ্য হয়েই থাকবে। এটা কি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভাজন নয়? সেইসঙ্গে, এটা কি শিল্পী হিসেবে নাসিরুদ্দিনদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া নয়?

একটা জিনিস স্পষ্ট, অতীতের কথা নাসিরুদ্দিন বড়ো তাড়াতাড়ি ভুলে যান। তিনি ভুলে গেছেন, হিন্দুরাই মুখ্যত তাকে নাসিরুদ্দিন শাহ বানিয়েছিল। আশির দশকে তাঁর আর্ট-ফিল্ম বোঝার মতো বিদ্যেবুদ্ধি এ দেশের সাধারণ মুসলমানদের ছিল, এমন অবান্তর দাবি বোধ হয় নাসিরুদ্দিনও করবেন না। তবুও তিনি হিন্দু বিদ্বেষী। নাসিরুদ্দিনকে বুঝতে আরও একটু পিছিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সময়টা আশির দশকই। ১৯৮৪ সাল। সেই বছরই নাসিরুদ্দিন পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছিলেন। তাকে সম্মান দিয়েছিল রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকার। ১৯৮৪ সালেই ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিশোধমত্ত কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে দিল্লিতে ভয়াবহ শিখ নিধন হয়েছিল। একদিনেই মারা গিয়েছিলেন তিন সহস্রাধিক শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ। সারা দেশের নিরীহ শান্তিকামী মানুষের বুক কাঁপানো মন্তব্য করেছিলেন রাজীব গান্ধী— 'বড়ো গাছ পড়ে গেলে চারপাশের মাটি এরকম একটু আধটু কাঁপে।' সেদিন ভয়াবহ শিখনিধনকে কার্যত সমর্থনই কারছিলেন রাজীব। অথচ এহেন রাজীবের কংগ্রেসের কাছ থেকে পুরস্কার নিতে নাসিরুদ্দিনের বাধেনি। তার একবারও মনে হয়নি, যেখানে সংখ্যালঘু শিখেরা বিপন্ন, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও সেখানে শান্তিতে থাকতে পারে না। নাসিরুদ্দিন নিজেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু শিখ হত্যাকারী রাজীব গান্ধীর মধ্যে অসহিষ্ণুতা দেখেননি। দেখেছেন নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে। অথচ নরেন্দ্র মোদী এমন একজন প্রধানমন্ত্রী যার আমলে কোথাও কোনও দাঙ্গা হয়নি।

শিল্প-সাহিত্যকে কমিউনিস্টরা যেভাবে প্রোপাগান্ডার মাধ্যম করেছে আর কেউ সেভাবে করেনি। যার ফলে বহু ভেজাল সাহিত্য মুলধারার সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে। গিরিশ কারনাডের নাটকেও আমরা সেই প্রোপাগান্ডা দেখতে পাই। ভারত এদের কাছে শোষিত নিপীড়িত অত্যাচারিত মানুষের দেশ। এবং শোষক নিপীড়ক অত্যাচারী মুলত হিন্দুরা। না, অবশ্যই সব হিন্দু নয়। কমিউনিস্টদের বিচারে তথাকথিত বর্ণহিন্দুরাই শ্রেণীশত্রু। দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু সমাজকে ভাগ করার চেষ্টা চলছে। একদিকে বর্ণহিন্দু, অন্যদিকে তথাকথিত নীচু জাত। এই প্রক্রিয়া চালাতে পারলে বেশ লাভ হয়। রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক দলের ভূতের নেত্য শুরু হয় আর কেন্দ্রে কংগ্রেস বার বার ফিরে আসে। কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বোঝাপড়াটা অদ্ভুত। অনেকটা তেল আর জলের মতো। দুটিতে মিলমিশ হয় না বলে সাধারণ্যে একটা ধারণা আছে। কিন্তু ওটা ভুল ধারণা। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে তেল আর জল বেশ মিলেমিশে যায়।

কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে আরও একটা লাভ আছে। যে সব সংস্থা নাসিরুদ্দিনদের চালনা করে তাদের অ্যাকাউন্টে বিদেশি অর্থের পাহাড় জমতে থাকে। কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য যেহেতু দেশকে উৎসন্নে পাঠানো, তাই নাসিরুদ্দিন শাহ গিরিশ কারনাডদের চালিকাশক্তি এনজিওগুলি দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করলেও কেউ কিছু বলে না। চলছে চলবে স্লোগানের নীচে ঢাকা পড়ে দেশের মানুষের মুখ। সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সহিতের ভাবকে বলে সাহিত্য। সাদা বাংলায়, সাহিত্য হলো মানুষকে কমিউনিকেট করার মাধ্যম। ঠিক এই জায়গায় গিরিশ-নাসিরুদ্দিনরা অনেকটা পিছনে পড়ে যান। তাদের কাজ মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না। ইন্টেলেকচুয়াল বলে আর একটা গোষ্ঠী তৈরি করতে হয়। বাংলায় যে শব্দের অপভ্রংশ হলো আঁতেল। নাসিরুদ্দিনরা আঁতেলের কুরঙ্গেই মেতে উঠেছেন। এই বয়সে এমন ভুলভাল মাতামাতি না করলেই ভালো করতেন। ■

প্রসঙ্গ : বঙ্গাব্দ

বঙ্গে সারদা আর্থিক প্রতারণার চাইতে ভয়াবহ প্রতারণা হচ্ছে বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের ইতিহাস প্রতারণা যা প্রতি বছর বাংলা সংবাদপত্রগুলি করেই চলেছে। বঙ্গাব্দের সঙ্গে সম্রাট আকবরের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও বাংলা সংবাদপত্রগুলি প্রচার করেই চলেছে 'বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হচ্ছেন সম্রাট আকবর' যা সর্বৈব মিথ্যা এবং প্রতারণা মাত্র। আমি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে এই প্রতারণার প্রতিকার চাই।

১ বৈশাখে প্রায় ১৭শো বছর আগে নববর্ষ উৎসবের জন্ম পাটলিপুত্র তথা পাটনায়। এই উৎসব হচ্ছে গুপ্তাব্দের নববর্ষ উৎসব। এর পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা পূর্বক যে বছর মহারাজ শশাঙ্ক সিংহাসনারোহণ করেন সেই বছর থেকেই শশাঙ্কচলিতাব্দের গণনা শুরু হয়। বছরটি পূর্ববৎ চান্দ্রবৎসরই ছিল। ঋক বৈদিক যুগ থেকেই হিন্দু ভারতবর্ষে চান্দ্রবর্ষ ও সৌর বছরের গণনা একই সঙ্গে চলে আসছে। সৌরমান না থাকলে চান্দ্রমানে মলমাস গণনা করা যায় না। তাছাড়া, ঋক্‌বেদে শঙ্কু (লিপইয়ার) বর্ষ গণনার উল্লেখও আছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজকার্যে চান্দ্র বছরের প্রচলন থাকায় শশাঙ্ক সংবতেও চান্দ্রমান ধরে বৈশাখি শুক্লপ্রতিপদে নববর্ষ উৎসব পূর্ববৎ প্রচলিতই থাকে। (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি বাংলা মাসের নামগুলি মূলত চান্দ্রমাসের নাম, সৌরমাসের নাম নয়।) শশাঙ্ক গতাসু হলে পরে গৌড়বঙ্গে মাৎস্যন্যায় চলাকালে মহারাজ শশাঙ্ক কর্তৃক আনীত শাকদ্বীপী (শাকল) ব্রাহ্মণরাই সৌরমানে বর্ষ গণনা শুরু করেন। শাকলরা আদিতে ছিলেন ফার্সিভাষী। এরা সংবৎ-কে 'সন' বলতেন। অতঃপর এই 'সন' বাঙ্গলাসন নামে পরিচিতি পায়। এই পর্যায়ে লিখিত অকাট্য তথ্য আমি চন্দরনগর (চন্দননগর) মহকুমা গ্রন্থাগার হতে প্রায় ছয় মাসের প্রচেষ্টায় উদ্ধার করতে সমর্থ হই। এবং এই সংবাদ বাংলা সংবাদপত্র-গুলিকেও জানানো হয়। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়েরা পূর্ববৎ বঙ্গাব্দের মনগড়া মিথ্যে ইতিহাসকেই প্রচার করে চলেছেন। আমি বেকুব বাঙ্গালিদের কাছে কোনও সম্মান চাইনে। আমি চাই, বাঙ্গালিরা বঙ্গাব্দের সঠিক ইতিহাসটা জানুক। তাই, কলিকাতা উচ্চন্যায়ালয়ে সবিনয় নিবেদন, সঠিক তথ্য বিচারের দায়িত্ব আদালত গ্রহণ করুক জনস্বার্থে এবং ঐতিহাসিক প্রতারণা হতে বাঙ্গালিকে মুক্তি দিন।

''কহিতে বাঙ্গলা সন মনে বিমর্ষিয়া।
দধিসূত শেষে যুগ চন্দ্রে চন্দ্র দিয়া।।''—৯১১ বাংলা সন।

বিশ্বকোষ অষ্টাদশ ভাগে উল্লিখিত কাব্য সমাপ্তিটি আছে এবং সেই সঙ্গে ৯১১ হিজরি, ১০৪ ইউসুপশাহি সন ও ৮৬৭ মঘী সনের উল্লেখ আছে একই বছরে। এছাড়া গুণরাজ খাঁ ৮৯২ সনের উল্লেখ আছে। আমার একটাই প্রশ্ন, ৯১১ বাংলা সনে আকবর তো দূরের কথা, তস্য পিতা হুমায়ুনের জন্ম হয়েছিল কী?

—মৃণাল হোড়,
বিন্দুবাসিনীপাড়া, চন্দননগর, হুগলী।

সত্য-মিথ্যা, সাদা-কালোর ব্যবধান যখন ঘুচে যায়

বিগত ৪-৫ বছর ধরে বাজারি পত্রিকার কল্যাণে কিছু কিছু নাম পাঠকদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, বলা যায় মুখস্থ করানো হয়েছে। সমাজতত্ত্বে 'কন্টেন্ট অ্যানালিসিস'-এ শেখানো হয়, একটা কন্টেন্ট বা বিষয়কে কত লক্ষ বার গণমাধ্যমে করা হয় তাহলে সর্বাগ্রে যে নামটা ভেসে উঠবে তার নাম অনুব্রত মণ্ডল। তার নাম যে কেষ্ট সেটাও কিন্তু সংবাদপত্র বাঙ্গালির কানে এবং মগজে ঢুকিয়েছে, গেঁথে দিয়েছে। যত ভয়ংকর ভয়ংকর শব্দ তার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে সংবাদপত্রের কল্যাণে কোটি কোটি বাঙ্গালির পাতে গিয়ে অহর্নিশ সেইসব শব্দগুলো আছড়ে পড়েছে। পুলিশকে বোমা মারা থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের গুড়-বাতাসা-জল খাওয়ানো,



এখন নকুল দানা। এই প্রতিটি শব্দ বাজারি পত্রিকাটি স্রোতের মতো পাঠকের চোখে মুখে কানে গুঁজে দিয়েছে। আর এইসব শব্দগুলো বাঙ্গালিরা গোগ্রাসে গিলেছে আর এক বিকৃত আনন্দ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে— এটাই কন্টেন্ট অ্যানালিসিস। একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা— তাকেই রং মাখানো হয়েছে, মশলা মাখানো হয়েছে, তারপর পাঠকের পাতে পরিবেশন করা হয়েছে। যেমন মমতা ব্যানার্জিকে অগ্নিকন্যা বলা এবং এই শব্দটি কোটি কোটি বার উচ্চারণ করা হয়েছে বিগত ৩০ বছরে।

কিন্তু কে জানত সারদা, নারদা স্টিং অপারেশন, অ্যালকেমিস্ট এবং গোলাপি উপত্যকার হাজার হাজার কোটি টাকা তার হাতের ছোঁয়াতেই তো তার ভাইদের ঘরে পৌঁছে গেছে। কিন্তু সংবাদপত্র যে শুধু তাকে অগ্নিকন্যা বানিয়েছে তাই নয়, সংবাদপত্র তাকে সততার প্রতীক বলেও মানুষকে খাইয়ে দিয়েছে। এটা কন্টেন্ট অ্যানালিসিসে ধরা পড়ে। কিন্তু কন্টেন্ট অ্যানালিসিস অত্যন্ত তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনাপূর্ণ শব্দ। বাজারি পত্রিকা এক পঙ্কিলতাপূর্ণ রাজনীতিবিদকেও অগ্নিকন্যা বানানোর ক্ষমতা রাখে, কারণ তার হাতে সেই আর্সেনল আছে। যে আর্সেনলের নাম টাকা। টাকা দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, মনোবিদ, পরিসংখ্যানবিদ সর্বোপরি সাহিত্যিক, লেখক, কলমচিদের কিনে নেওয়া হয়। তারপর রসালো ও আকর্ষণীয় করে বাজারে ছাড়া হয়, সেই জন্যই তো তার নাম বাজারি পত্রিকা। যেখানে যত দুর্গন্ধ, যত পুতিগন্ধময় রাজনীতিবিদ, যত পচন, যত নোংরা সবের উপরেই আতর ছড়ানো হয়, আর এই আতর ছড়ানোর কাজই করে তাদের সাহিত্যিক, লেখক, কলমচিরা।

বাজারি পত্রিকাতেই প্রিয় কেষ্ট'র কিছু

উদ্ধৃতি চোখে ভেসে উঠল। তিনি বলছেন, 'আর পারছি না, বড্ড ক্লান্ত লাগছে। মা চলে গিয়েছেন গত মাসে, স্ত্রী দেড় মাস ধরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার নিউটাউনের এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।' বলছেন তিনি মঞ্চে উঠলে, তার আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, যা মুখে আসে তাই বলেন— কেষ্ট'র কি এখন অনুতাপ হচ্ছে? না সেই অন্ধকারের রাজনীতিবিদের ছত্রছায়ায় যারা থাকে তাদের কোনো সময় অনুতাপ হয় না। কেষ্ট কি বিবেকের দংশনে ভুগছেন? এই অন্ধকারের নেত্রীর সঙ্গে যারাই যাবেন তারাই অন্ধকারের গহ্বরে ঢুকবেন, বিবেক, মনুষ্যত্ব সবই ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যাবে। দেখছেন না পরিবর্তন চাই বলে যেসব বুদ্ধিজীবী যেমন সন্তোষ ভট্টাচার্য, সুনন্দ সান্যাল, বিভাস চক্রবর্তী, কৌশিক সেন, সুমন মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকেই কেমন দু-এক বছরের মধ্যে তাঁর কর্দমাক্ত রাজনীতির হাত থেকে বাঁচতে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছেন। সেই রাজনীতির একটিই কথা, নানান প্রলোভন দিয়ে মানুষকে কাছে নেওয়া, তারপর তাকে হায়নার মতে হিংস্র করে তোলা। হাতে তুলে দাও চপার, ভোজালি, রামদা---বিরোধীদের মেরে ঝুলিয়ে দাও— এই রাজনীতির চোরাস্রোত থেকে কেউ কেউ বোধহয় বেরিয়ে আসতেও চায়। তাই বলছিলাম এ এক সীমাহীন অন্ধকার, নরকের ভেতর নরক। মান-ইজ্জত-সম্ভ্রম-লজ্জাবোধ এখানে আসেই না--- তাছাড়া তিনি এসবের কারবারও করেন না। কি লজ্জাবোধ, কী সংবিধান, কী সাংবিধানিক, কী রীতিনীতি, কী সংসদ, কী সংসদীয় কার্যপদ্ধতি এসবকে তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দেন।

—শুভ্র সান্যাল,
মালদহ।

উত্তর ২৪ পরগনায় বিজেপি 'মিরাকল' ঘটাতে পারে

রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নমূলক বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ সত্ত্বেও পরিবর্তনের সরকারের দুটো পর্ব পূর্তির আগেই রাজ্যের শাসকদলের বেসামাল অবস্থায় কেমন 'গেল গেল রব' উঠেছে। এর প্রধান কারণ হিসাবে দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞমহল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে নেত্রী সমস্ত কর্মীসভায় কঠোর নির্দেশিকা জারি করা সত্ত্বেও সেই নির্দেশিকাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন প্রতিটি জেলার বড়ো, মাঝারি, ছোটো সমস্ত নেতা-নেত্রী। যার ফলস্বরূপ ২০১৯ সালের চলতি পর্বের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ঘিরে রীতিমতো অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে বলে বিশ্লেষক মহলের অভিমত। রাজ্যের মোট ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্র উত্তর ২৪ পরগনায়। কেন্দ্রগুলি হলো— বনগাঁ, বসিরহাট, ব্যারাকপুর, বারাসাত ও দমদম। এই পাঁচটি কেন্দ্রই ২০০৯ সাল থেকে তৃণমূলের দখলে। কিন্তু এবারে কেন্দ্রগুলি ধরে রাখার ক্ষেত্রে এক বড়ো ধরণের প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। জেলার পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রে পঁয়ত্রিশটি বিধানসভা এলাকাতেই বিরোধী দল বিজেপির মার্জিন বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর কারণ হিসেবে বিশ্লেষকদের মন্তব্য, ভেতরে ভেতরে শাসকদল-বিরোধী একটা চোরাস্রোত কাজ করছে। তাদের আরও মন্তব্য, এই জেলায় শাসকদলের মূল লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে। গত লোকসভা অর্থাৎ ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের একটি পরিসংখ্যান তারা তুলে ধরেন।

সুতরাং বিগত লোকসভা নির্বাচনের শতাংশের পরিসংখ্যানে বামফ্রন্ট ছিল দ্বিতীয় স্থানে। বিজেপি তৃতীয় এবং কংগ্রেস ছিল একেবারে তলানিতে। কিন্তু এবারে তলে তলে বিজেপির পক্ষে জেলা জুড়ে একটা চোরাস্রোত বইছে বলে বিশ্লেষকদের অনুমান। তাদের মতে, এর ফলে ২০১৪-র অনুপাতে বাম ভোট অনেকখানি কমবে। এই জেলায় বিজেপির যদি প্রায় পনেরো শতাংশ ভোট বৃদ্ধি পায়, তাহলে ভোটের অঙ্ক অন্য জায়গায় যেতে পারে। পাশাপাশি যদি সঠিকভাবে ভোট হয়, তবে এই জেলায় বিজেপি 'মিরাকল' ফলাফল করতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

—ডাঃ গৌতমকুমার ভদ্র,
রাজারহাট, কলকাতা-১৩৫।

সাধ্বী প্রজ্ঞার শহিদদের প্রতি বক্তব্য প্রসঙ্গে কিছু কথা

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে বিজেপির সাধ্বী প্রজ্ঞার মনোনয়ন ও তাঁর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এক রাজনৈতিক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের ওয়াটার্লু সম ভোট যুদ্ধে সমস্ত বিরোধীদলগুলি এবং কিছু প্রচার মাধ্যম অবিরাম ভাবে বলে চলেছে যে সাধ্বী প্রজ্ঞা তাঁর বক্তব্যে শহিদদের অপমানিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ইতিহাস বিস্মৃত জাতির মনে করা উচিত মহাত্মা সাধ্বীর বক্তব্যগুলি— (১) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে শহিদের প্রতি, অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজদের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। (২) ভগৎ সিংহের আত্মাহুতির প্রতি তাঁর বক্তব্য, (৩) স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যার সময় ও যতীন দাসের ৬৩ দিন অনশনের পর লাহোর জেলে মৃত্যুবরণের পর তাঁর একটি উক্তি "diabolical snicide অর্থাৎ প্রতিহিংসা পরায়ণ আত্মহত্যা"। কাজেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে দেশমাতৃকার প্রতি যাঁরা জীবন ত্যাগ করে শহিদ হন তাঁদের প্রতি একজন সর্বোচ্চ নেতার উক্তিগুলি বিশেষ ভাবে স্মরণ করে নিলেই বিরোধীদের এই প্রমাদ বকা বন্ধ হয়ে যাবে, বিশেষত যেখানে সাধ্বী প্রজ্ঞা পরেরদিন তাঁর বক্তব্যের জন্য যখন ক্ষমা চেয়েছেন, কিন্তু গান্ধীজী কোনোদিন তাঁর ব্যক্তগুলির জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন বলে আমাদের কাছে জানা নেই।

—সৌমেন নিয়োগী,
কলকাতা-৭০০০২৫



নিরাপত্তাবিহীন আশ্রয়

সুতপা বসাক ভড়

অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তানদের যখন কোনো আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়, তখন মনে হয়, যাক্, বাচ্চাটা বেঁচে গেল! কিন্তু সত্যিই কি তাই? বর্তমানে ওই আশ্রয়দাত্রী মহিলারা ছোটো ছোটো মেয়েদের দেহ-বাজারে পৌঁছে দিচ্ছে। টাটা ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সের একটি রিপোর্ট থেকে যখন জানা যায় যে, আশ্রয় গৃহের ৪২ জনের মধ্যে ৩৪ জন মেয়ে যৌন শোষণের শিকার হয়েছে, তখন শোরগোল পড়ে যায়। এজন্য বিহারের তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মঞ্জু বর্মা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে থাকেন যে, এই ব্যাপারে তার স্বামী চন্দ্রেশ্বর বর্মার কোনো হাত নেই। মঞ্জু বর্মার মতে, তার স্বামী কেবলমাত্র একবার তার সঙ্গে আশ্রয়স্থলে গিয়েছিল। অথচ প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য সবাই নীচে থাকত, শুধু চন্দ্রেশ্বর বর্মা ওপরে যেত, যেখানে মেয়েরা থাকত। এই আশ্রয়স্থলের আর একজন অপরাধী ব্রজেশ ঠাকুর একটি এনজিও চালায়, যার গালভরা নাম— সেবা সংকল্প এবং বিকাশ সমিতি।

বিহারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জানিয়েছিলেন যে, অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হবে। টাটা ইন্সটিটিউটের রিপোর্ট যদি না আসত তাহলে আরও কতদিন ধরে যে ওই বাচ্চা মেয়েরা অত্যাচারিত হতো তার ঠিকানা নেই। ওই মেয়েগুলি প্রথমে নিজেদের জন্মদাতা এবং জন্মদাত্রীর দ্বারা পরিত্যাজ্য, বেঁচে থাকার জন্য তারা ওই আশ্রয়গৃহের শরণ নিতে বাধ্য হয়েছিল। শুরু থেকেই প্রতারিত ওই বাচ্চাদের সঙ্গে এইরকম অমানবিক অত্যাচার ভাষায় নিন্দা করা যায় না। তাদের সবসময় ঘরে বন্ধ করে রাখা হতো। শুধু খাবার সময় তারা বাইরে বেরোতে পারত। টাটা ইন্সটিটিউট থেকে জানানো হয়েছিল যে, মোতিহারী, মুঙ্গের, ভাগলপুর এবং গয়ায় ছোটো ছোটো ছেলেরাও নানাভাবে যৌন শোষণের শিকার হয়ে থাকে, অথচ এই ঘটনাগুলি মিডিয়াতে বিশেষ কোনো গুরুত্ব পায়নি। বালিকাগৃহের ব্যাপারে অনেক পদস্থ অধিকারীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এগারো জনের মধ্যে দশজন অপরাধীকে ধরা হয়েছে।

এদিকে দেওরিয়ার বিন্ধ্যবাসিনী আশ্রয়গৃহ থেকেও এই ধরনের খবর আসছিল। শোনা যায় যে, আশ্রমের বাসিন্দা একটি ১১ বছরের মেয়েকে আশ্রয়গৃহের সঞ্চালিকা গিরিজা ত্রিপাঠী তার ঘর মোছার আদেশ দেয়। মেয়েটি যখন ঘর মুছছিল, তখন একটি ফোন আসে এবং গিরিজা ত্রিপাঠী ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ফাঁকে বাচ্চা মেয়েটি সেখান থেকে পালিয়ে সোজা থানায় যায়। পুলিশকর্মীরাও তার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়। এরপর দ্রুতগতিতে পুলিশের হস্তক্ষেত্রে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসে। মেয়েটি জানায় যে, সন্ধ্যে হলেই নানা রঙের গাড়ি আশ্রয়গৃহে আসে এবং সঞ্চালিকা দিদি আশ্রমের মেয়েদের নিয়ে কোথায় যেন চলে যায়। সকাল হলে মেয়েগুলি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে আর জিজ্ঞাসা করলে কোনো উত্তর দেয় না। ছোট্ট মেয়েটিকে প্রথমে সৎমার অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তারপর তাকে মামারবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দাদু, দিদাও তার দেখাশুনা করেনি। মেয়েটিকে বিন্ধ্যবাসিনী আশ্রয়গৃহে পাঠিয়ে দেয়। অথচ ওইটুকু মেয়ে নিজের উপস্থিত বুদ্ধির বলে নিজেকে এবং আশ্রয়গৃহের অন্য মেয়েদেরও ওই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভে সাহায্য করে। এরপর মেয়েটির বয়ানের ওপর ভিত্তি করে পুলিশ এবং উত্তরপ্রদেশ সরকার খুব তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নেয়। সঞ্চালিকা গিরিজা ত্রিপাঠী এবং তার স্বামী মোহন ত্রিপাঠীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই আশ্রয়গৃহ থেকে ২৪ জন মেয়েকে মুক্ত করা হয়েছিল। শোনা যায়, গিরিজা ত্রিপাঠী হঠাৎ করে কোটিপতি হয়ে যায়। এছাড়া, তথাকথিত সমাজসেবার জন্য সে অনেক সরকারি-বেসরকারি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছে। এদিকে ওই আশ্রয়গৃহটি সম্বন্ধে স্থানীয় লোকজনের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও গিরিজার সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর হরদোইয়ের এইরকম একটি বালিকা গৃহের সঞ্চালিকাকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেখান থেকে ১৯ জন মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দিল্লি মহিলা আয়োগের অধ্যক্ষা স্বাতী মালিওয়াল এবং মেনকা গান্ধী এই সম্পর্কে দ্রুত বিচার এবং অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেবার নির্দেশ দেন। বাস্তব সত্য হলো, দুষ্কর্মের ঘটনার যত রিপোর্ট সরকারি নথি থাকে, তার থেকে অনেক বেশি ঘটনা সমাজে ঘটে চলেছে। ছোটো মেয়েদের সুরক্ষার জন্য বানানো এইসব আশ্রয়গৃহগুলিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটা খুবই লজ্জার। সরকার থেকে মোটা টাকা অনুদান পাবার পরেও ওইসব আশ্রয়গৃহের সঞ্চালিকাদের চাহিদা মেটে না, তারা ওই ছোটো ছোটো অসহায় মেয়েদের নরকের মধ্যে ঠেলে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এইসব অসৎ, নীচ পরিচালকদের কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি দেওয়া হোক, যাতে আর কেউ শিশুকন্যাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সাহস না পায়। ■

মৌরি ও কালোজিরা ঔষধীয় গুণে ভরপুর

অসিতবরণ আইচ

● মৌরি পাঁচফোড়নের একটি বস্তু। সবার সঙ্গে মিশে এক অসাধারণ গন্ধ সৃষ্টি করে। অনেক রান্নায় মৌরিসহ পাঁচফোড়ন ব্যবহৃত না হলে সেটা সুখাদ্য হয় না।

● মৌরি চিবিয়ে খাওয়া যায়, ভেজানো জল খাওয়া যায়। গরম জলে সেদ্ধ করে জল অর্ধেক করে ক্বাথ বানিয়েও খাওয়া যায়। আবার হালকা ভেজেও খাওয়া যায়।



● পাঁচ গ্রাম মৌরী দু' কাপ জলে সেদ্ধ করে এক কাপ অবস্থায় নামিয়ে ছেঁকে নিলেই ক্বাথ তৈরি হয়।

● মৌরির ক্বাথ দিনে ২/৩ বার খেলে অনিয়মিত রজঃস্রাব বা হঠাৎ বন্ধ হলে উপকার পাওয়া যাবে।

● মৌরি ভেজানো জলে পেট ফাঁপা দূর হয়। গ্যাস-অম্বল কমায়। হজম শক্তি বাড়ায়। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

● মৌরির ক্বাথ ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখে। হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক রাখে।

● গর্ভাবস্থায় দুর্বলতা ও বমি ভাব দূর করতে মৌরির ক্বাথ দিনে দু'বার খেতে হবে।

● মৌরির জল শরীর ঠাণ্ডা রাখে এবং মূত্রবৃদ্ধি করে।

● চায়ের সঙ্গে মৌরি খেলে রক্ত ভালো থাকে হাঁপানির সমস্যা দূর করে। দিনে ২-৩ বার খেতে হবে।

● মৌরির আঁশ কোলন ক্যান্সারে অত্যন্ত লাভদায়ক। সেদ্ধ করে জলসহ মৌরিও খেতে হবে চিবিয়ে।

● মৌরি ভেজানো জলে চোখ ধুলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে।

● প্রসূতির স্তনে পর্যাপ্ত দুধের জন্য নেই মৌরির ক্বাথ দিনে ৪/৫ বার খেতে হবে।

● মৌরি যেকোনো ভাবে খেলেই স্মৃতিশক্তি বাড়ে। মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

● মৌরি পাতার রস কৃমি নাশ করে।

কালোজিরা

● দেখতে কালো কিন্তু গুণে ভালো। শুধুমাত্র রান্নাকে সুগন্ধিত করে না। ঔষধীয় গুণে ভরপুর।

● কালোজিরা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে। স্মৃতিশক্তি বাড়ার জন্য ১/২ বা ১ চামচ কালোজিরার তেল খেতে হবে।

● কালোজিরা তেল ফুটিয়ে গায়ে মাখলে চুলকানির উপশম হয়।

● কালোজিরা পেটের বায়ু নাশ করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। চূর্ণ গরম ভাতে খেতে হবে।

● কালোজিরা চূর্ণ সুতির ন্যাকড়ায় পুঁটলি করে নাকে ঘ্রাণে নিলে সর্দি কমে। গোটা কালোজিরাতেও কাজ হবে।

● চা ও কালোজিরা সমপরিমাণ নিয়ে চা বানিয়ে খেলে শরীরের মেদ কমে। সর্দি-কাশিতেও উপকার।

● কালোজিরা বেটে জলে গুলে খেলে হজম শক্তি বাড়ে। দিনে ২/৩ বার খেতে হবে।

● গিটে গিটে ব্যথায় কালোজিরার তেল মাখলে লাভ হয়।

● অনিয়মিত অল্প বা অধিক স্রাবের জন্য যারা কষ্ট পান তারা ঋতুর ৫/৭ দিন আগে থেকে ১/২ গ্রাম কালোজিরা চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলে গুলে সকলে বিকাল ২/৩ মাস খাবেন। উপকার পাবেন।

● কালোজিরা গুঁড়ো দিয়ে ভাত মেখে খেলে বাত কমে। কফ দূর করে।

● মাথাব্যথা দূর করে। কানের দু'পাশে কালোজিরার তেল মাখতে হবে। মাইগ্রেন কমায়।

● কালোজিরের তেল অলিভ অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে চুলে মাখলে চুলপড়া রোধ করে।

● গরমজলে কালোজিরে ফুটিয়ে সেই জল ঠাণ্ডা করে কুলি করলে মাড়ি ফোলা দাঁতের ব্যথা কমায়।

● এক চিমটি কালোজিরা সকালে জলের সঙ্গে খেলে ডায়াবিটিস কমে।

● রুটি, লুচি, পরোটায় কালোজিরা খাওয়ার অভ্যেস করলে লাভবান হবে। মাঝে মাঝে গরমভাতে কালোজিরার গুঁড়ো খেতে হয়।

● লিভার-ফুসফুস-কিডনির স্বাস্থ্যরক্ষায় কালোজিরার ভূমিকা অসাধারণ।

● গর্ভবতী অবস্থায় বেশি কালোজিরা খেলে গর্ভপাত ঘটায়।

● নিম্ন-রক্তচাপ বাড়ায় আর উচ্চ-রক্তচাপ কমায়। ▮

" ভারত মাতা কি জয় "



জঙ্গলমহল দিচ্ছে ডাক, দেশ বিরোধীরা নিপাত যাক

প্রথমেই সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই গৈরিক অভিনন্দন। আগামী ১২ই মে ঝাড়গ্রাম লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ। আমাদের প্রার্থী বিশিষ্ট সমাজসেবী খড়্গপুর I.I.T এর প্রাক্তনী, ইঞ্জিনিয়ার তথা জঙ্গলমহলের বিভিন্ন আন্দোলনের শরিক মাননীয় শ্রী কুনার হেমব্রম।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপট এবারের নির্বাচন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের দাবি ছিনিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম।

দীর্ঘ কালধরে এই লোকসভা আসনে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থী সংসদ গিয়েও জঙ্গলমহলের মানুষের মনের কথা, বুকের ব্যাথা, এমনকি জঙ্গলমহলের সার্বিক উন্নয়নের কথা কোনদিন তুলে ধরলেন না, তাই সমাজের মধ্যে আন্দোলন, সংগ্রাম,সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ব্যক্তি,সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব, লোকসভায় দাঁড়িয়ে জঙ্গলমহলের দাবী আদায় করে আনতে পারবে, সেই রকম মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী কুনার হেমব্রম কে বিপুল ভোটে জয়ী করে লোকসভার যোগ্য সাংসদ হিসাবে পাঠানোর আবেদন জানাই।

ভালো মানুষ, মাটির মানুষ, কাজের মানুষ, কাছের মানুষ কুনার হেমব্রম -কে বিপুল ভোটে জয়ী করে নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করুন।

ধন্যবাদ সহ,

বি.জে.পি ঝাড়গ্রাম লোকসভা

আবার একবার মোদী সরকার

Advt.

উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বিজেপির ঘোষণাপত্র।



পৌঁছান আপনার মনের কথা আমাদের কাছে,
চলুন গড়ে তুলি ভবিষ্যতের ভারত একসাথে

আসন্ন সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচনে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন ৬ই মে ২০১৯
আপনার মূল্যবান ভোট আরো শক্তিশালী, আরো মজবুত নতুন ভারত গড়তে সাহায্য করবে।



ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী

জয় ব্যানার্জী কে

বিপুল ভোটে জয়ী করুন

ভারতীয় জনতা পার্টি পদ্মফুলে বোতাম টিপুন - কেন্দ্রে আবার মোদী অনুন

Advt.

- বাঁকুড়ার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে
- পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র হত্যাকারী সরকারের হাত থেকে রেহাই পেতে



আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মোদীজির হাত শক্ত করতে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী

ডাঃ সুভাষ সরকার কে

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন



আরও একবার মোদী সরকার

/BJP4Bengal 9875425279 bjpbengal.org

Advt.

মেদিনীপুরে ভালো মার্জিন রেখে জিতব : দিলীপ ঘোষ



□ এবারের নির্বাচনে মূল্যবৃদ্ধি ইস্যু নেই। চারিদিকে একটাই আওয়াজ, মোদী হটাও। এটা কি রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা নয়?

দিলীপ ঘোষ : কেন্দ্রে যারা ক্ষমতায় থাকে পশ্চিমবঙ্গে বরাবরই তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়। এ কাজটা আগে সিপিএম করত। এখন দায়িত্ব নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিন আগে সবাইকে ডেকে এনে নাচানাচি করেছেন। কিন্তু লাভ কিছু হয়নি। তাই স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, মোদী হটাও। কিন্তু তাতেও লাভ হবে না। মোদীজী আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। বিজেপিও আরও শক্তিশালী হবে।

□ পশ্চিমবঙ্গে ভোট মানেই হিংসা। এই পরিস্থিতিতে সুষ্ঠ নির্বাচন কি সম্ভব? আর নির্বাচন আবাধ না হলে আপনাদের তেইশটি আসন জেতার লক্ষ্য পূরণ করা কতদূর সম্ভব?

দিলীপ ঘোষ : হিংসা হয়তো হয়েছে, তবে ব্যাপক ভাবে হয়নি। আমরা জানতাম কেন্দ্রীয় বাহিনী এলে হিংসা ব্যাপক হবে না। আমরা এও জানতাম সাধারণ মানুষ যেদিন রুখে দাঁড়াবেন সেদিন থেকে এ রাজ্যের নির্বাচনে হিংসা বন্ধ হয়ে যাবে। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। চোপরায় ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ রাস্তা অবরোধ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষই গণতন্ত্র রক্ষায় উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন।

□ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোট কি ভাগ হবে। হলে কার লাভ?

দিলীপ ঘোষ : দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো পার্টি ক্ষমতায় এসেছে তারা কেউ মুসলমানদের মানুষ হিসেবে দেখেনি। শুধু ভোটার ভেবেছে। ফলে এ র‍্যাজ্যে মুসলমানদের উন্নতি হয়নি। কেন্দ্রের মোদী সরকার তাদের উন্নয়নের কথা ভেবেছে। সুতরাং বিজেপির প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী পালটে গেছে। ভোট ভাগাভাগির কথা না বলে বলা ভালো, এবার অসংখ্য মুসলমান বিজেপিকেই ভোট দেবে। অসমে যেমন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গেও তাই হবে।

□ এবারের নির্বাচনে প্রধান ইস্যু জাতীয় নিরাপত্তা। এ ব্যাপারে সাধারণ বাঙ্গালির সাড়া কীরকম?

দিলীপ ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গে প্রায় অর্ধেক মানুষ দেশভাগের পর বাংলাদেশ থেকে ছিন্নমূল হয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশের নাগরিকত্বের বিষয়টি এখনও ঝুলে আছে। জাতীয় নিরাপত্তার গুরুত্ব এ রাজ্যের মানুষ খুব ভালো বোঝেন। তাই বিজেপির সমর্থনে তারা এগিয়ে আসছেন।

□ এবার মোদীঝড় কি আদৌ আছে?

দিলীপ ঘোষ : এতদিন যারা বলছিলেন মোদী ঝড় নেই, তারাও এখন মোদী ঝড় আছে বলে স্বীকার করছেন। নয়তো মোদীজীর সভায় ভিড় এমন উপচে পড়ত না। মোদী ঝড় আছে এবং দিন দিন সেই ঝড় বাড়ছে।

□ এবার বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে কটি আসন পাবে?

দিলীপ ঘোষ : তেইশটি নয় বিজেপি তার থেকেও বেশি আসন পাবে। আমাদের দল হবে রাজ্যের সব থেকে বড়ো দল।

□ আপনি মেদিনীপুর কেন্দ্রে প্রার্থী। কীরকম বুঝছেন?

দিলীপ ঘোষ : বেশ ভালো। তৃণমূলের দুর্নীতি এবং উন্নয়নের নামে প্রতারণায় মানুষ ক্ষুব্ধ। সব জায়গায় মানুষের ক্ষোভের আঁচ পাচ্ছি। মানুষ এখন পরিবর্তনের পরিবর্তন চাইছে। তাই জেতার ব্যাপারে আমি আশাবাদী। আমার বিশ্বাস, মেদিনীপুর থেকে আমরা শুধু জিতব না, ভালো মার্জিন রেখে জিতব।



Advt.





সম্পূর্ণ বিকাশ
বিজেপির প্রয়াস

দুর্নীতি ও একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে
লোককল্যাণকর স্থায়ী সরকার গড়ার লক্ষ্যে
আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে
ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী

অর্জুন সিংহ-কে

বিপুল ভোটে জয়ী করুন



এই চিহ্নে ভোট দিন

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন

Advt.

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট
লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির মনোনীত
প্রার্থী সায়ন্তন বসুকে -



এই চিহ্নে

ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন



Advt.



সবার সাথে - সবার উন্নতি

কেন্দ্রে শক্তিশালী

স্থিতিশীল সরকার

গড়তে

জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে

বি. জে. পি. প্রার্থী

ডাঃ অশোক কান্ডারী

কে



পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে

বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন।

Advt.



With Best
Compliments from :-

Ramprasad Das

Bolpur

Advt.



অক্ষয়তৃতীয়া সত্য-সুন্দরে একাত্ম হওয়ার দিন

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ঘুরছে কালের চাকা। অনন্তকাল ধরে। একই ছন্দে। একই রূপে। এই আবর্তনের পাকে পাকে আসে রাত্রি। আসে দিন। প্রতিটি দিনই কিন্তু আসে নতুন একটি বার্তা নিয়ে। প্রতিটি দিনই হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের এক একটি দিক নির্দেশক। এমনই একটি দিন অক্ষয়তৃতীয়া।

হিন্দু এবং জৈন সমাজের কাছে বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া দিনটি যেন হিরণ্যবর্ণময়। এই দিনটি আসে এক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে। দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারত-জীবনের অসংখ্য অর্থবহ ঘটনা। আর সে কারণেই দিনটি সকলের কাছেই এক পুণ্যদিন। এই দিনটিতে তাই হিন্দু সমাজ নানা পুণ্যকর্মে নিয়োজিত রাখে নিজেদের। পূজা- অর্চনা-স্নান-দান-ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে এই দিনটিতে ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি অক্ষয় রাখার সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক সম্পদও প্রার্থনা করে সকলে।



আর সেইখানেই প্রকাশ পায় ভারতীয় ঐতিহ্য ও অধ্যাত্মচেতনার এক অপরূপ দ্যোতনা।

বিভিন্ন পুরাণ, স্মৃতি শাস্ত্রে এই দিনটির তাৎপর্যের কথা বলা হয়েছে অতি সুন্দর ভাবে। রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব থেকে জানা যায়, বৈশাখের এই শুক্ল-তৃতীয়াতেই সুচনা হয়েছিল সত্য যুগের। কালের আবর্তনে এখন চতুর্থ যুগ কলি। কিন্তু সত্যযুগের এই সূচনার দিনটিকে নানাভাবে পালন করে এই সময়ও মানুষ ক্ষণিকের জন্য হলেও সত্যযুগের পুণ্য পরিবেশকে স্মরণ করে অনন্ত শান্তির আনন্দ উপভোগ করে থাকে। এই অপার্থিব আনন্দ উপভোগের পেছনে যে মানসিকতা সক্রিয় থাকে, কোনো ব্যাখ্যাতেই তাকে নস্যাৎ বা খাটো করা যায় না।

ভারতীয় নারী এই দিনটিতে পালন করেন অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রত। ভগবান বিষ্ণুর পূজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ব্রাহ্মণকে দান কয়েক জলপূর্ণ কলস। বরণ করেন এয়োস্ত্রী মহিলাদের। অন্নে-বস্ত্রে-শাঁখা-সিঁদুর আলতায় তাঁদের আপ্যায়িত করে প্রার্থনা করেন স্বামীর দীর্ঘ জীবনের। প্রার্থনা করেন নিজের সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখার।

পুরাণ ও মহাকাব্যের নানা উল্লেখ থেকে জানা যায়, বৈশাখের এই পুণ্যদিনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। ক্ষাত্রশক্তির ঔদ্ধত্য, অন্যায়

অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি আবার সত্য-সুন্দর ও ন্যায়কে। একারণেই অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে ভারতের বহু জায়গাতেই বিশেষ করে অর্চনা করা হয় ভগবান পরশুরামের। বিষ্ণুর আরাধনার মধ্য দিয়েই দেশে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা জানানো হয় এদিন।

কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত সগররাজার ষাট হাজার সন্তানের মুক্তির জন্য স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যভূমিতে নিয়ে আসার সাধনা শুরু করেন সগরের নাতি অংশুমান। বত্রিশ হাজার বছর তপস্যা করেও স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনতে পারেননি অংশুমান। তাঁর মৃত্যুর পর একই ভাবে তপস্যা করেও ব্যর্থ হন তার ছেলে দিলীপ। অবশেষে দিলীপের ছেলে ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে প্রবাহিত হয় গঙ্গা। পুরাণ-কথা, এই অক্ষয়তৃতীয়ার দিনই মর্ত্যে অবতরণ করে গঙ্গা। এই কারণেই অক্ষয়তৃতীয়ার দিন গঙ্গাস্নান করে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হতে চান ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা।

মহাভারত থেকেও জানা যায় অক্ষয়তৃতীয়ার বিশেষ তাৎপর্যের কথা। বেদব্যাস মহাভারত রচনার সময় লেখক হিসেবে পান পার্বতীপুত্র গণেশকে। বেদব্যাস মুখে মুখে মহাভারতের শ্লোক রচনা করে বলে যেতেন কোথাও না থেমে। আর গণেশও সেই শ্লোক শুনে শুনে লিখে রাখাতেন। আর ওই ভাবেই রচিত হয় মহাভারত। বেদব্যাসের কথনে মহাভারত লেখার কাজটি গণেশ শুরু করেছিলেন বৈশাখের এই অক্ষয়তৃতীয়ার দিনেই।

সে কারণেই হিন্দুদের বিশ্বাস, এই দিন ব্যবসা-বাণিজ্য, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি কাজের সূচনা করলে তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবেই। এই বিশ্বাস থেকে আজও বহু ব্যবসায়ীই নববর্ষের হালখাতায় সূচনা করেন এই অক্ষয়তৃতীয়ার দিন থেকে। এই দিন তাঁরা বিশেষ পূজা-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। কোথাও বা লক্ষ্মীজনার্দনের পূজা করা হয়, আবার কোথাও হয় লক্ষ্মী ও গণেশের পূজা। সেইসঙ্গে স্থানীয় শিব বা কালীমন্দিরেও পূজা দিয়ে শুভ সূচনা করা হয় হিসেবের নতুন খাতার।

মহাভারতেই আরেক জায়গায় আছে, কৌরবদের চক্রান্তে পাণ্ডবরা বনবাসে গেলে দুঃখিত হন তাঁদের স্বজন-অনুরাগী বন্ধুবান্ধব সকলেই। বনবাসকালে যাতে কোনো ভাবেই পাণ্ডবরা অন্নকষ্ট ভোগ না করেন তাঁর জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দিয়েছিলেন এক অক্ষয়পাত্র। সেই পাতের অন্ন কখনই শেষ হতো না। এই অক্ষয়পাত্রের অন্ন দিয়েই পাণ্ডবরা নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তির নিবৃত্তি করতেন। সেইসঙ্গে ওই অন্ন দিয়েই অতিথিসেবা, দেবপূজা সবই তাঁরা করতেন। অক্ষয়পাত্রের জন্যই বনবাসের সময় পাণ্ডবদের কখনই অন্নকষ্টে ভুগতে হয়নি। এই অক্ষয় অন্নপাত্রটি শ্রীকৃষ্ণ যেদিন পাণ্ডবদের দেন— সেই দিনটি ছিল বৈশাখের শুক্লাতৃতীয়া। তাই এই অক্ষয় তৃতীয়ায় অন্নদানও হয়ে উঠেছে ব্রতপালনের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

বৈষ্ণবদের কাছেও এই অক্ষয়তৃতীয়ার দিনটি নানা কারণেই অত্যন্ত অর্থবহ। দ্বাপরে কৃষ্ণলীলার এক অপূর্ব অধ্যায় বন্ধু সুদামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণা বিতরণ।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামা। বাল্যে গোকুলে তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সখা। বৃন্দাবনলীলা শেষে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে রাজা হন। ব্রজের রাখাল রাজা হয়েও ভোলেননি তাঁর বাল্যের লীলাস্থলকে। তাই মথুরায় থেকেও তিনি সবসময়ই ছিলেন গোকুলের প্রতি অনুকূল। স্মৃতি তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে যেত গোকুলে।

বাল্যসখা সুদামা ব্রত পরায়ণ সদ্ ব্রাহ্মণ। অর্থ উপার্জনে ছিলেন না তেমন পারঙ্গম। তাই রোজগারপাতি প্রায় কিছুই করতে পারতেন না। ফলে দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। তবুও মথুরারাজ বন্ধু কৃষ্ণের কাছে কখনই অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি কোনো কিছুই প্রার্থনা করেননি। বরং ঈশ্বর জ্ঞানে বাল্যসখাকে পুজোই করতেন।

একদিন শেষে স্ত্রীর কথাতেই এক মুঠো চিঁড়ে চাদরে বেঁধে তিনি মথুরায় যান কৃষ্ণের কাছে। মনে অবশ্য দ্বিধা ছিল। দ্বিধা ঘুচল মথুরায় গিয়ে। কৃষ্ণ বাল্যসখাকে সাদরে বরণ করে সস্ত্রীক তাঁর সেবা করেন নানাভাবে। অবিভূত সুদামা কিন্তু বন্ধুকে সেই এক মুঠো চিঁড়ে দিতে পারেননি লজ্জায়। কৃষ্ণ সবকিছু বুঝেই এরকরম জোর করে বন্ধুর আনা সেই শুকনো চিঁড়ে খেতে থাকেন। তৃপ্ত হন তিনি। এরপরও সুদামা সেদিন কোনোভাবেই অর্থ বা পার্থিব কিছু চাইতে পারেননি। ঈশ্বরজ্ঞানে চেয়েছেন শুধু তাঁর পরমপদ। শ্রীকৃষ্ণ তাই সুদামার অজান্তেই তাঁকে করেন বিপুল সম্পদের অধিকারী। সুদামাকে এই সম্পদদানের দিনটিও ছিল বৈশাখের শুক্ল তৃতীয়। তাই এই তিথি বৈষ্ণবদের কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই দিন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজো করেন।

অক্ষয়তৃতীয়ার দিনেই বৈষ্ণবরা পালন করেন শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা। গ্রীষ্মের দাবদাহে তপ্ত শ্রীকৃষ্ণের দেহকে শীতল করতে তাঁরা এদিন কৃষ্ণবিগ্রহকে বিশেষ ভাবে চন্দনলিপ্ত করেন। আর সেইভাবেই তাঁরা একাত্ম হন তাঁদের আরাধ্যের সঙ্গে।

জানা যায়, এই অক্ষয়তৃতীয়ার মিলেই মহামায়া আবির্ভূত হয়েছিলেন মা অন্নপূর্ণা রূপে। মিটিয়েছিলেন জগতের অন্নকষ্ট।

আবার এই দিনেই কুবের করেছিলেন লক্ষ্মীর পূজা। আর তাতেই তিনি হন ধনাধ্যক্ষ। সেই স্মৃতি স্মরণ করেই অনেকে অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে সোনা বা অন্য কিছু কেনাকাটা করে থাকেন। বস্তুত বঙ্গদেশে ধনতেরাস চালু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ধনরত্ন-সম্পদ কেনার দিন হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে অক্ষয়তৃতীয়ার দিনটি।

জৈনরাও এই দিনটি পালন করেন পরম নিষ্ঠায়। জৈনধর্মের আদিগুরু আদিনাথের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই দিনটি।

সব মিলিয়ে অক্ষয়তৃতীয়া শুধুই বছরের একটি দিন নয়— এটি সুস্থ-সুন্দর জীবন যাপনের একটি পরমদিন। তাই সারা ভারত জুড়েই দিনটি পালন করা হয় আন্তরিক শ্রদ্ধা আর ভক্তিতে।

(অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

রবীন্দ্রসঙ্গীতে উপনিষদের ভাবনা

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

উপনিষদ রবীন্দ্রনাথের বড়ো প্রিয় ছিল। তিনি বলেছেন, ''ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড। ...তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র; তিনি অন্তরতম, তিনি সুদূরতম। তাহার সত্যে আমরা সত্য, তাহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত।''



উপনিষদের ঋষি বলেছেন :

''আনন্দ্যদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।''

সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হতে সমস্ত প্রাণী জন্মায়। সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই সমস্ত প্রাণী জীবিত রয়েছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই তারা গমন করে।

উপনিষদের এই শ্লোকটি কবির অতি প্রিয় ছিল। তাই তিনি তাঁর গানে কখনো বলেছেন :

''আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্তগগনে।।''

কখনো বলেছেন, 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।'

উপনিষদে রয়েছে :

''তে ধ্যানযোগানুগত্য অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তানাধিতিষ্ঠত্যেকঃ।।''

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ)

অর্থাৎ, ঋষিরা নিবিড় ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে দর্শন করলেন জ্যোতির্ময় পরমাত্মার শক্তিই এই জগৎসংসারের কারণ। মায়া তার তিন গুণের সাহায্যে সেই পরমাত্মাকে এই বিশ্বের থেকে অন্তরালে রাখে। কিন্তু সেই এক এবং অদ্বিতীয় পরমাত্মাই জীবাত্মা এবং সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই সত্যেরই কাব্যরূপ দেখতে পাই রবীন্দ্রসঙ্গীতে :

''...যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে,
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে।''

সেই এক পরমেশ্বর তাঁর সৃষ্টিতে এবং মানব হৃদয়ের অন্তরে, সর্বত্র বিরাজিত। যথার্থ সাধক তাঁকে এভাবেই দর্শন করেন। উপনিষদের ঋষি বলেছেন :

''তিলেষু তৈলং দধিনীচ সর্পি—
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাহত্মনি গৃহ্যতেহসৌ
সত্যেনৈনং তপস্য যোহনুপশ্যতি।।''

তিল পেষণে তেল লাভ হয়, দধি মন্থনে মাখন ওঠে, শুষ্ক নদী খনন করলে জল পাওয়া যায়, কাঠে কাঠ ঘষলে অগ্নি নির্গত হয়। তেমনই সত্য ও আত্মসংযম সহকারে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হলে পরমাত্মার সঙ্গে অভিযুক্ত উপলব্ধি করা যায়, রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয় অনেক পথ পেরিয়ে তবে এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। যে পথ তিনি পেরিয়েছেন সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছেন :

''আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে আমি পাইনি
তোমায় দেখতে আমি পাইনি।''

পরমপুরুষকে বারংবার আহ্বান করেছেন কবি—

''মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।''

পরে পরমসত্য উপলব্ধি করেছেন :

''প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে,
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।।
... ...
ওগো সবার ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।।''

উপনিষদ তো তাই বলেছে—

''যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ।।''

ধূলিধূসরিত একতাল সোনা পরিষ্কৃত হলে যেমন তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসে, তেমনই কেউ যখন নিজের আত্মাকে সকলের আত্মা বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তখন তিনি সব দুঃখের পারে চলে যান।

কবি সেই পরমপুরুষকে নিবিড় ভাবে ভালোবাসতেন। তার কাছে অর্থ-সম্পদ কিছু নয়, তাঁর সঙ্গই শুধু কাম্য ছিল। তাই কখনো গেয়েছেন :

''আজি বিজনঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শূন্যহাতে—
আমি তাইতে কি ভয় মানি!
জানি, জানি, বন্ধু, জানি
তোমার আছে তো হাতখানি।''

কখনও বা বলেছেন,

''ওই হাসি যে দেয় ধুয়ে মোর বিরহের রোদন,
ও মোর ভালোবাসার ধন।''

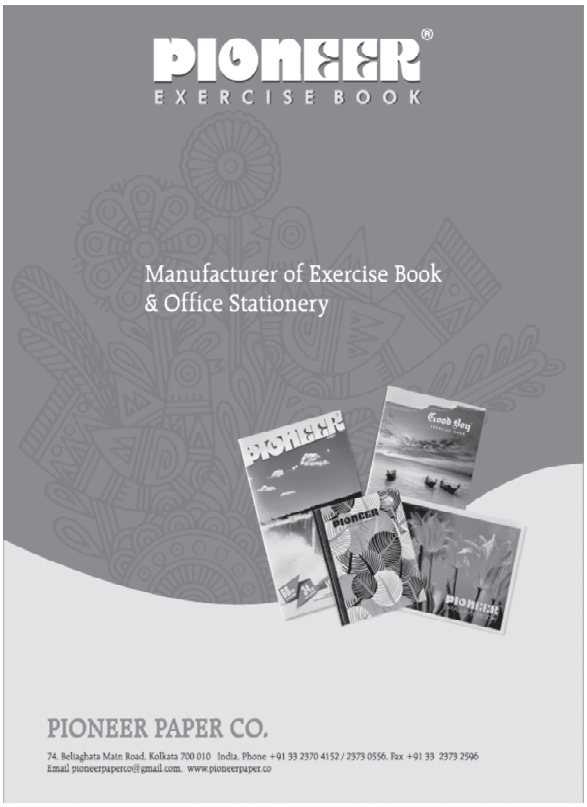
উপনিষদ তো একথাই বলেছে— পার্থিব বস্তুর লোভ ত্যাগ করে তাঁকে চাইতে হয়। তাঁকে পেলে সাধক পরমানন্দ লাভ করেন। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

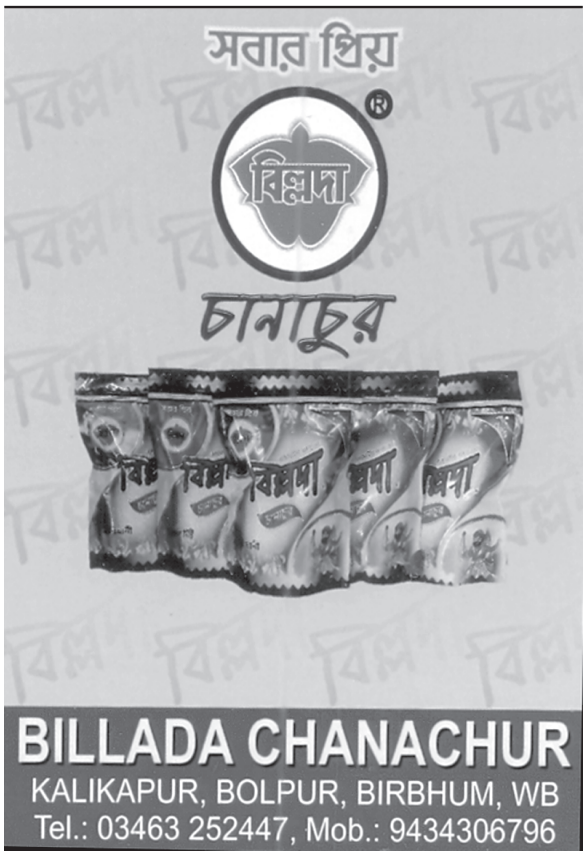
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫



ভাবুন পঁচাত্তরটি ‘সত্যিকথা’, ভোটদিন তারপর

সনাতন রায়

ভোট দেবেন কাকে?

আপনি অবশ্যই বলবেন, ‘‘আমার যাকে ইচ্ছে হবে তাকে।’’

একথা বলার হক আপনার আছে। সংবিধান আপনাকে সে অধিকার দিয়েছে। ভারতবাসী হিসেবে আপনার ভোট বিক্রয়যোগ্য নয়। আর ভোটাধিকার একান্তভাবেই আপনার নিজস্ব। কিন্তু তবুও ভোট দেবার আগে একটু তো ভাবনা চিন্তা করে নিতেই হয়, কাকে ভোট দেবেন? অর্থাৎ প্রার্থী হিসেবে কাকে বেছে নেবেন? কোন দলকে ভোট দেবেন? পশ্চিমবঙ্গে আপনার প্রথম পছন্দ কোন দল? আর ভাবতে হবে কেন দেবেন? বা কোনও দল বা প্রার্থীকে কেন দেবেন না?

এই ভাবনাচিন্তাটারই নাম ভোট সচেতনতা। কেউ কেউ বলেন রাজনৈতিক সচেতনতা। এই চেতনাশক্তির সঠিক গুণমানই নির্ধারণ করে, নির্বাচনে সঠিক দল এবং সঠিক প্রার্থী নির্বাচিত হলো কিনা। এই চেতনাই স্থির করে দেয়, দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি চলবে কোন পথে। সেই পথ কি কেবলই দলমুখী নাকি জনমুখী?

ভারতবর্ষের লোকসভা নির্বাচন চলছে। এবং এবারের নির্বাচনে কম বেশি সব দলেরই পাখির চোখ পশ্চিমবঙ্গ। কারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিরোধিতা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই যতটা তীব্র চেহারা নিয়েছে, অন্য রাজ্যে ততটা হয়নি। অথবা বলা চলে, নেহাতই রাজনৈতিক কারণে রাজ্য সরকার একতরফাভাবে যেভাবে কেন্দ্রের বিরোধিতা করে চলেছে তা নজিরবিহীন। ফলে নির্বাচনী উত্তাপ চরমে। এই উত্তাপ আরও তীব্র কারণ এবারই প্রথম সঠিক বিরোধী শক্তি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে উঠে এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। গত কয়েক মাস আগের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্য শাসকদলের পেশিশক্তির ব্যবহারের পাল্টা শক্তি হিসেবেও উঠে এসেছে বিজেপি। ফলে একাধারে রাজনৈতিক মোকাবিলা, অন্যদিকে পেশিশক্তির মোকাবিলায় যুযুধান দু’পক্ষই।

আপনি এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান জানেন। আপনার অভিজ্ঞতা আছে—কোন দল কেমন। তবুও এমন অনেক তথ্যই আপনার কাছে এসে পৌঁছয়নি অথবা আপনি ভেবেই দেখেননি





যা শুনলে বা ভাবলে আপনি ভোট দেবার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পারবেন। ভোটকেন্দ্রে ঢোকার আগে প্রতিটি স্তরের মানুষের সামনে ভেসে ওঠা উচিত সেই প্রশ্নগুলি যা মানুষের সচেতনতার পরিচয় দেবে।

এই প্রবন্ধে আমরা সেরকমই কিছু বাছাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরব যেগুলোর উত্তরে আপনার দেওয়া ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’-ই ঠিক করবে আগামী পাঁচ বছর ভারত হাঁটবে কোন পথে?

প্রশ্নগুলি হল : আপনি কি এমন কোনও ব্যক্তি বা ওই ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন দলকে ভোট দেবেন ?

১। যাঁর নিজের বা তাঁর পরিষদবর্গের মুখের ভাষা কুৎসিত?

২। যিনি চিটফান্ড কাণ্ডে গরিবের টাকা লোটেন। হাজার হাজার কোটি টাকা। আবার সেই লুটের তদন্তেই বাধা দেন সশরীরে ধরনায় বসে।

৩। যাঁর শরীরি ভাষা কদর্য এবং বঙ্গসংস্কৃতির পরিপন্থী।

৪। যাঁর নিম্নরুচির প্রকাশভঙ্গিমা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে লজ্জিত করে।

৫। যিনি পুরোপুরি মস্তানি ভাষায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, তিনি রাজ্যের গুন্ডাদের কন্ট্রোল করেন।

৬। যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাবেন বলে ঘোষণা করেন।

৭। যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নিতে চান।

৮। প্রধানমন্ত্রী ‘দিদি’ বলে সম্বোধন করলেও

তিনি প্রত্যুত্তরে তাঁকে 'গব্বর সিং', 'ডাকাত সর্দার' বলে গালাগালি দেন।

৯। যিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, রাজ্যে কোনও বিরোধী দল থাকবে না। ৪২ টা আসনই তিনি জিতবেন যেভাবেই হোক।

১০। যাঁর নির্দেশে তাঁর দলীয় কর্মীরা ডায়মন্ড হারবার থেকে কুচবিহার অবাধে ভোট লুট করে, ছাপ্পা ভোট দেয়, বোমা ছোঁড়ে, গুলি ছোঁড়ে, মানুষ মারে।

১১। যাঁর টালির চালের ঘরে চলে দু'খানা এসি মেসিন, যিনি রিবক কোম্পানির হাওয়াই চপ্পল পরেন, যাঁর জন্য ধনিয়াখালিতে তৈরি হয় মসলিন তৈরির কায়দায় সেরা সুতির শাড়ি।

১২। যিনি আপনার ভোটে জয়ী হয়ে নিজের পরিবারকে আর্থিকভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কলাগাছ করে তুলছেন।

১৩। যিনি নিজে হতে চান প্রধানমন্ত্রী আর দলের সব পুরনো কর্মীদের লাথি মেরে রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রোজেক্ট করেন ভাইপোকে।

১৪। যাঁর ভাইপো বাস করেন এক বিধবার লুট করা সম্পত্তিতে তৈরি প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, যেখানে সিঁড়ির বদলে আছে এসকালেটর, আছে সুইমিং পুল, আছে থাইল্যান্ড থেকে পাচার করা নামীদামি বুদ্ধমূর্তিসহ নানারকম ইনটিরিয়র ডেকরেশন আইটেম আর এক কোটি টাকার ঝাড়বাতি।

১৫। যাঁর ভাইয়েরাই গোটা রাজ্যে নীল সাদা রঙ সরবরাহ করে।

১৬। যাঁর বড়ো ভাই এখন ভারতসেরা চেইন অব হোটেলের মালিক।

১৭। যাঁর ছোটোভাই কলকাতার ফুটবল ক্লাবগুলির নিয়ামক এবং গোটা কালীঘাট অঞ্চলের মাফিয়া-ত্রাস।

১৯। যার ভাইয়েরা কালীঘাট অঞ্চলের ৬৫টি প্লট কিনেছেন কম দামে। গায়ের জোরে এবং গোটা এলাকাটিই হয়ে উঠেছে ব্যানার্জিপাড়া।

২০। যিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক পরিকাঠামোকে অস্বীকার করেন।

২১। যিনি কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে নিজের রাজ্যের নামে চালিয়ে দাবি করেন প্রকল্পগুলি তাঁর। যেমন স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্প হয়েছে নির্মল বাংলা মিশন। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার নাম হয়েছে বাংলা সড়ক যোজনা। যিনি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে অস্বীকার করে রাজ্যের কোটি কোটি মানুষকে প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন।

২২। যিনি পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির পথে স্পিডব্রেকার বলে চিহ্নিত হন।

২৩। যাঁর নির্দেশে রাজ্যের ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের তালিকা কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয় না যাতে তাঁরা কৃষি সম্মান যোজনার অর্থ থেকে বঞ্চিত হন। মৎস্যজীবীদের নাম পাঠানো হয় না যাতে মৎস্যচাষীরা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতাভুক্ত না হতে পারেন এবং প্রচার করতে পারেন, কেন্দ্র রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করেছে।

২৪। যাঁর নেতৃত্বে সিন্ডিকেট রাজ (প্রোমোটিং, বালি খাদান, মাটি খাদান, কয়লা খাদান, রেলওয়ের স্ক্রাপ) ছাড়া কোনও কাজ করা যায় না।

২৫। যিনি তোলাবাজদের প্রশয় দেন এবং প্রকাশ্য সভায় নির্দেশ দেন সংগৃহীত অর্থের ৭৫ শতাংশ দলকে দিতে হবে।

২৬। যাঁর আমলে একের পর এক সেতু ভেঙে পড়ে।

২৭। যিনি প্রাক্তন রেলমন্ত্রী হয়েও রাজ্যে মেট্রো রেলের কাজ রুখে দেন।

২৮। যাঁর নেতৃত্বাধীন রাজ্যে কলেজে ভর্তি হতে গেলে, চাকরি পেতে গেলে, জমি কিনতে গেলে, বাড়ি কিনতে গেলে তোলাবাজদের খুশি করতে হয় আগে।

২৯। যিনি মিথ্যা বলেন বেশি, সত্য বলেন কদাচিৎ

৩০। যিনি যে স্কুলে বাংলা শিক্ষক দরকার সেখানে পাঠান উর্দু শিক্ষক। ছাত্ররা প্রতিবাদ করলে, তাঁর পুলিশ তাদের বুকে গুলি চালায়।

৩১। মুসলমানরা তাঁর কাছে প্রধান নাগরিক। তাই তাদের জন্য সব প্রকল্প প্রাধান্য পায়। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা বাজেটে যা খরচ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি বাজেট ধরা হয় মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে।

৩২। যাঁর নেতৃত্বে হিন্দু-শত্রু রোহিঙ্গারা এরাজ্যে আশ্রয় পায়।

৩৩। যাঁর নেতৃত্বে এরাজ্যে মুসলিম অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটে অবাধে এবং মাত্র গত ৮ বছরে রাজ্যের মুসলমান জনসংখ্যা দাঁড়িয়ে যায় সর্বকালীন রেকর্ডে।

৩৩। যাঁর সরকারে শিল্পখাতে বাজেট বরাদ্দ ২১৫৪ কোটি টাকা। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ ২০১৫ কোটি টাকা।

৩৪। যিনি শিল্প ধরার নামে পেটোয়া সাংবাদিকদের নিয়ে ঘন ঘন বিদেশে বেড়াতে যান কিন্তু শিল্প আসে না।

৩৪। যিনি প্রতি বছর শিল্প সামিটের নামে জনগণের কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করেন।

৩৬। যাঁর আমলে অপরাধী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনও হিন্দুর দায়ের করা অভিযোগ গ্রহণ করা হয় না।

৩৭। যাঁর আমলে পশ্চিমবঙ্গ ড্রাগ ব্যবসার স্বর্গভূমি হয়ে উঠেছে, পশ্চিমবঙ্গ এখন ড্রাগ হাব হিসেবে চিহ্নিত।

৩৮। অপরাধ প্রবণতায় পশ্চিমবঙ্গ এখন প্রথম দশ রাজ্যের মধ্যে অষ্টম স্থানে। এসবই হয়েছে তাঁর আমলে।

৩৯। যাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে নারীপাচারকারী রাজ্য হিসেবে সেরা রাজ্যের স্থান দখল করেছে।

৪০। যাঁর আমলে মহিলা নির্যাতনে রাজ্য এখন সেরা।

৪১। যাঁর প্রশাসনে পশ্চিমবঙ্গে অ্যাসিড আক্রমণের ঘটনাতেও সবার ওপরে।

৪২। যাঁর আমলে বেআইনি অস্ত্র কারখানার ঘাঁটি হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজারহাটের ছোট গাঁতি গ্রাম তার অন্যতম।

৪৩। কন্যাশ্রী/রূপশ্রী প্রকল্পে যাঁর আমলে মেয়েদের বাল্যবিবাহ রুখতে এবং পড়াশোনার শ্রীবৃদ্ধিতে এখনও পর্যন্ত

খরচ হয়েছে ৩৫০০ কোটি টাকা, সেই তাঁর নেতৃত্বাধীন রাজ্যেই বাল্যবিবাহের ঘটনা দেশের মধ্যে সবার ওপরে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে শুধুমাত্র মালদা জেলায় বাল্যবিবাহ হয়েছে ৪০.৭% নাবালিকার।

৪৪। যাঁর আমলে নারীধর্ষণে সেরা পশ্চিমবঙ্গ।

৪৫। যাঁর আমলে নাবালিকা মায়ের সংখ্যা এরাজ্যেই সবচেয়ে বেশি।

৪৬। যাঁর আমলে জালনোটের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে পশ্চিমবাঙ্গলা।

৪৭। যাঁর প্রশাসনে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কমেছে মাত্রাতিরিক্ত হারে। কারণ বিদেশি ট্যুরিস্টরা পশ্চিমবঙ্গকে নিরাপদ মনে করেন না। বহু মহিলা ট্যুরিস্ট এরাজ্যে নিগৃহীতা/ধর্ষিতা হয়েছেন।

৪৮। এরাজ্যে ডাকাতি এবং ছিনতাই যার আমলে সবচেয়ে বেশি।

৪৯। যার আমলে সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা দেওয়া হয় না। চাইলে তাঁদের তিনি কুত্তা বলেন।

৫০। রাজ্যে ঋণের পরিমাণ ভারত সেরা। সদ্যোজাত শিশুর ঋণ ৪৫ হাজার টাকা। ঋণের পরিমাণ মোট ৪,৩১, ৯২৮ কোটি টাকা।

৫১। যাঁর আমলে অধ্যক্ষ পেটানো, অধ্যাপক পেটানো, শিক্ষক পেটানো, ছাত্র পেটানো নিত্যদিনের ঘটনা।

৫২। যার আমলে কলেজগুলিতে ৭০% অধ্যাপকের আসন ফাঁকা।

৫৩। যাঁর রাজ্যে কম্পিউটার শিক্ষকদের মাহিনা মাথাপিছু দশহাজার টাকা করে চুরি করে রাজ্য সরকার।

৫৪। যাঁর আমলে ৩০ হাজার টাকা মাইনের শিক্ষক পদে ২০০০ টাকা মাইনের সিভিক টিচার নেওয়া হয়।

৫৫। যাঁর আমলে ৩০ হাজার টাকা মাইনের কনস্টেবল না নিয়ে ৬০০০ টাকার সিভিল পুলিশ নিয়োগ করা হয়।

৫৬। যার আমলে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পকেও চাকরি সংস্থানের হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয় ৬ কোটি চাকরি দেওয়া হয়েছে।

৫৭। ধরনা যাঁর মূলধন সেই তিনিই চাকরির দাবিকে এসএসসি পাস যুবক যুবতীদের ২৮ দিনের ধরনা, অনশন বন্ধ করে দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করেন ধরনার ওপর।

৫৮। যিনি সেনাবিদ্রোহে উস্কানি দেন।

৫৯। যিনি রাজ্য পুলিসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পুলিসের মারপিট বাঁধিয়ে দেন।

৬০। যাঁর আমলে হাসপাতাল আছে—যন্ত্র নেই, ডাক্তার নেই, নার্স নেই। নিজেই বলেন—ডাক্তার নেই, হাসপাতালে বেড বাড়বে না।

৬১। কন্যাশ্রী প্রকল্পের সাইকেল যাঁর আমলে হরির লুটের মতো বিলি করা হচ্ছে।

৬২। যাঁর আমলে ক্লাব পিছু ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে ঘুষ হিসেবে। এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে ৬০০ কোটি টাকা।

৬৩। যার আসলে কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ার পর স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েছে ৫০ শতাংশ।

৬৪। যাঁর আমলে স্কুলের মিড ডে মিল মাঝে মাঝেই বন্ধ থাকে। প্রতিদিন গড়ে ১০০০ স্কুলে মিড ডে মিলের খাবার দেওয়া হয় না।

৬৫। যাঁর বাড়িতে তাইল্যান্ডের নাগরিক বসবাস করেন।

৬৬। সেই বিদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে তাইল্যান্ড থেকে সোনা পাচারের অভিযোগ ওঠে। মিথ্যা পিতৃপরিচয় ধরা পড়ে।

৬৭। যিনি মাওবাদীদের সাহায্যে ক্ষমতায় এসেছেন। আর ক্ষমতায় এসেই তিনি মাওনেতা কিষানজীকে গুলি করে মারেন। ছত্রধর মাহাতো জেলে পচেন। রহস্যজনক মৃত্যু হয় শশধর মাহাতোর। সুচিত্রা মাহাতো ঘরবন্দি হয়ে থাকেন।

৬৮। গ্রামে গ্রামে চোলাই মদের জোগান বাড়িয়ে দেন যিনি।

৬৯। চোলাই মদ খেয়ে মৃত্যু হলে যিনি দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেন।

৭০। যিনি জিএসটি প্রকল্পে উপকৃত হয়েও মিথ্যা কথা রটান।

৭১। যিনি সব জেনে সব বুঝেও নোটবন্দি নিয়ে মানুষকে ভুল তথ্য জানান।

৭২। যিনি নিজে যে অপরাধ করেন সেগুলিই অন্যদের নামে চাপান।

৭৩। যিনি সবচেয়ে বড়ো দেশদ্রোহী। কারণ তিনি সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে দেশভাগের চক্রান্ত করেন।

৭৩। যিনি সব চেয়ে বড় অপরাধী, কারণ তাঁর আমলেই পশ্চিমবঙ্গ অপরাধপ্রবণ রাজ্যের তকমা পেয়েছে।

৭৪। যিনি সব থেকে বড়ো বিশ্বাসঘাতক, কারণ তাঁর কাছের মানুষদের কাছ থেকে উপকার নিয়ে তাদের ঠেলে ফেলে দিয়েছেন—যেমন মুকুল রায়, তাপস পাল, কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র, সোনালি গুহ, কৃষ্ণা চক্রবর্তী ইত্যাদি।

৭৫। যিনি কালসর্প। যিনি স্বৈরাচারী। বিশ্বের প্রথম নারী হিটলার।

আরও আছে। তাঁর গুণের শেষ নেই। পশ্চিমবঙ্গে সুশিক্ষিত, সচেতন, সংস্কৃতি সম্পন্ন ভোটারবৃন্দ—কথাগুলো একটু ভেবে দেখবেন। ভোট আপনার। অধিকার আপনার। কিন্তু একটু ভেবে ভোট দিন, কারণ নানা সামাজিক কারণের অজুহাতে ওই মহিলা প্রশাসক আপনার ভোটটা কিনতে চাইছেন, যা সংবিধান বিরুদ্ধ। উনি আপনাকে ঘুষ দিয়ে ভিখারি বানাতে চাইছেন। উন্নয়ন তাঁর লক্ষ্য নয়। এটাও সংবিধান বিরুদ্ধ। আপনাকে ভিখারি বানানোর অধিকার তাঁর নেই। ভাবুন, ভাবতে শিখুন। কারণ রাজ্যটা আপনার। এ রাজ্যের ভবিষ্যৎটা আপনার আগামী প্রজন্মেরও ভবিষ্যৎ। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

ছোট্ট রবির কথা

আজ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সাজো সাজো রব। সব কিছুই যেন বেশি সুন্দর আর নিয়মমাফিক হচ্ছে। কোনও কিছুরই একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেরকমই ইচ্ছে। আর সেরকমটা হবেই না বা কেন, আজ যে প্রথমবার রবি তার বাবামশাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাবে। বাড়ির বাইরে এই প্রথম তার বেরোনো। সে অনেক দূর বেড়াতে যাবে। সেই সুদূর হিমালয়ে।

আজ সকাল থেকে রবির আনন্দ আর ধরে না। এতদিন সে বইয়ের পাতাতেই পড়েছে পাহাড়-নদী-বরফের কথা। আজ সে চাক্ষুষ করবে বরফ ঘেরা পাহাড় কেমন হয়, কেমন হয় হিমালয়ের কোলে সূর্যোদয়।

একটা যেন কিছু থেকেই যাচ্ছে রবির মনে। বাবামশাইয়ের সঙ্গে রবি কোনওদিনই খুব সহজ নয়। বাবাকে দূর থেকেই সে বরাবর দেখত। কোনও দিন তেতলার ছাদ থেকে, কোনও দিন বারন্দা থেকে দেখত। বেশিরভাগ সময়েই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ির বাইরে বাইরে থাকতেন। প্রায় সময়ই রবি বাবাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত। কারণ বাবামশাই এলে তো আবার বারন্দায় ছোটাছুটি করে খেলাধুলা করাও বন্ধ হয়ে যেত। তা সেই বাবামশাইয়ের সঙ্গে সে এবার চলেছে হিমালয় দর্শনে।

আজ তো রবির একটুকুও দেরি করতে ইচ্ছে করছে না। কখন যে বাইরে বেরুবে আর কখন যে ট্রেনে উঠবে এসব ভাবতেই সে ব্যস্ত। আজ তার কী আনন্দই না হচ্ছে। বাবামশাই হঠাৎ করেই বললেন হিমালয়ে যাবার কথা। তখন সদ্য রবির বৈদিক মতে উপনয়ন হয়েছে। আর পৈতের আগে কত না ঝক্কি। বেচারামবাবু প্রায় প্রতিদিনই কতবার এসেছেন তাকে বৈদিক মন্ত্র মুখস্ত করাতেন। মহর্ষি এসব কাজে কোনওদিনই ফাঁকি দেওয়া একদম পছন্দ করতেন না সেটা ছোট্ট রবি খুব ভালোভাবেই জানতো। তাই মন দিয়ে সমস্ত মন্ত্র কণ্ঠস্থ করেছিল সে। উপনয়নের সব কিছুই তার খুব ভালো লেগেছিল, শুধু মাথা



নেড়া করাটা ছাড়া। এই নিয়ে বন্ধুরা হাসাহাসি করেছে। কিন্তু বাড়ির বড়োরা বলেছেন যে এটাই নাকি নিয়ম। ঠিক এই সময়ে একদিন বাবামশাই তাকে ডাকলেন তাঁর বৈঠকখানার ঘরে। এমনিতে সেখানে যাওয়ার কোনও নিয়ম ছিল না। কিন্তু বাবামশাই নিজে ডেকেছেন, তাই রবি ভয়ে ভয়ে হাজির হলো। মহর্ষি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার সঙ্গে হিমালয় দর্শন করতে চাও? শুনে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। শ্বেতশুভ্র পোশাকে ঋষির মতো আরাম কেদারায় বসে আছেন মহর্ষি। চিৎকার করে হ্যাঁ বলতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু বড়োদের সামনে জোরে কথা বলার নিয়ম নেই। তাই যথা সম্ভব মাথা নেড়ে সে তার মনের কথা জানিয়েছিল।

এই প্রথম রবির জন্য পোশাক বানানো হলো অর্ডার দিয়ে। জড়ির কাজ করা মখমলের গোল টুপি, জোব্বা, আরও কত কিছু। বেরনোর আগে প্রতিবারের মতো পরিবারের সকলকে নিয়ে উপাসনায় বসলেন মহর্ষি। উপাসনা শেষে গুরুজনদের প্রণাম করে বাবামশাইয়ের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বসল রবি। তারপর ট্রেনে, সে যে কী আনন্দ। ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন তার পক্ষে। চারদিক দিয়ে গাছপালা, ধানক্ষেত, মাঠ সব যেন হু হু করে ছুটে যাচ্ছে। এর আগে কোনও দিন সে মা, দাদাদের ছেড়ে বাড়ির বাইরে যায়নি। মনটা কেমন করছে তবু মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে।

হিমালয় দর্শনে যাওয়ার আগে ছোট্ট রবিকে নিয়ে বোলপুরে আসেন মহর্ষি। বোলপুরের সেই ছাতিমগাছ, তাঁর কেনা জমি সবই রবিকে দেখালেন তিনি। লাল পাথুরে মাটির দেশ বোলপুর। প্রথম দর্শনেই খুব ভালো লাগে রবির। বাবামশাইয়ের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সে যেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

এই সময় থেকেই বাবামশইয়ের সঙ্গে গভীর ও নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় রবির। খুব ভালো লেগে যায় বোলপুর। কোথাও বাঁধাধরা গণ্ডি নেই, নিয়ম নেই, ইস্কুলের পড়াশোনার থেকে এ অনেক ভালো। প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে পড়াশোনা। এখানে গাছ ছায়া দেয়, পাখিরা সঙ্গ দেয়, প্রকৃতি মেলে দেয় সবুজ আঁচল। সেই শুরু। রবি ধীরে ধীরে বিশ্বপ্রকৃতির দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে উঠছিলেন।

এরপর তার হিমালয় দর্শন, শিলাইদহে সময় কাটানো সবই ধারাবাহিক ভাবে রবিকে বিশ্বকবি বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শুরুটা সেই ছোট্টবেলায় বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। এর বহু বছর পর শান্তিনিকেতনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন রবি ঠাকুর। তারও বহু বছর পর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে রাঙামাটির পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারা যাবে রবি ঠাকুর প্রকৃতির যে পাঠ আমাদের শিখিয়েছিলেন তা কতটা জরুরি। শুধুমাত্র বইয়ের মধ্যেই শিক্ষার বীজ লুকিয়ে থাকে না, প্রকৃতি মা-ও আমাদের কত কিছু শেখায়। তাই রবি ঠাকুর বিশ্বভারতীর পঠনপাঠনের মধ্যে শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ই রাখেননি, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় শিক্ষার যোগও রেখেছেন।

বৃষ্টি মজুমদার

ভারতের পথে পথে

চিত্রকূট



মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলা ও উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলা জুড়ে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে ত্রেতাযুগের চিত্রকূট অরণ্য। সেখানে পাহাড় ও বনের মধ্যে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী নদী। কারভি, সীতাপুর, কামতা, কোহরি ও নয়াগাঁও এই পাঁচটি গ্রাম নিয়ে চিত্রকূট। সুদূর অতীতে এখানে মুনি-ঋষিদের বাস ছিল। আজ কোল, ভীল প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা এখানে বাস করে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের স্মৃতিবিজড়িত চিত্রকূট অতি পবিত্র হিন্দু তীর্থ। বাল্মীকি, ব্যাসদেব, কালিদাস তাঁদের কাব্যে চিরন্তন করে রেখেছেন চিত্রকূটকে। এখানে রয়েছে মত্ত গজেন্দ্র শিবমন্দির, পর্ণকুটির, ব্রহ্মার যজ্ঞবেদি তোতামুখী হনুমান মূর্তি, গোস্বামী তুলসী দাসের হাতে রাম-লক্ষ্মণের টিপ পরার স্মারক,প্রমোদ বন,লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির, রাঘব প্রয়াগ ঘাট, রামঘাট, হনুমান ধারা, গুপ্ত গোদাবরী, সতী অনসূয়া মন্দির, জানকী কুণ্ড, সীতা কুণ্ড, সীতাদেবীর চরণ চিহ্ন, কামতাগিরি মন্দির, লক্ষ্মণ মন্দির, ভরত কূপ, কোটিতীর্থ, পম্পা সরোবর প্রভৃতি নানান মন্দিরে ভরপুর।

জানো কি?

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যটি সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন।
- রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব সম্মানে ভূষিত করেন সুভাষচন্দ্র বসু।
- তাঁর 'গোরা' উপন্যাসটি ভারতের বাইরে রাশিয়ায় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।
- তিনি নিজের লেখা 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন।
- তিনি বাংলাদেশে লালন ফকিরের গান শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ভালো কথা

১লা বৈশাখের উপহার

আমার বাবা একদিন বাজার থেকে একটা কার্ড এনেছে। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম বাবা ওটা কিসের কার্ড? বাবা বলল পতঞ্জলি স্টোর্সের হালখাতার কার্ড। ১লা বৈশাখে তারা ছোটোখাটো উপহার দেবে। আমি শুনে খুব খুশি হলাম, ভাবলাম মিষ্টির প্যাকেট দেবে। আমি বাবাকে বললাম আমিও তোমার সঙ্গে যাব। ১লা বৈশাখ বাবার সঙ্গে গেলাম। বাবা কিছু জিনিস কিনল। আমি মনে মনে ভাবছি কখন উপহারটি দেবে। তখনই বাবাকে দোকানের একজন বললেন এই নিন আমাদের তরফ থেকে একটি ভালো জাতের পেয়ারা চারা। প্রথমে আমার একটু খারাপ লেগেছিল, পরে ভেবে দেখলাম গাছ প্রকৃতির পক্ষে খুবই ভালো। আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি, তাই চারাটি আমাদের কাজের মাসিকে দেওয়া হলো। চারাটি পেয়ে মাসিও খুব খুশি হলো। আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো পতঞ্জলি স্টোর্সের অভিনব উপহার দেওয়া দেখে।

আরাত্রিকা মিশ্র, তৃতীয় শ্রেণী, তাম্রলিপ্ত, পূর্ব মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

ভোটের বাদ্যি

আকাশ কুমার, একাদশ শ্রেণী, বলরামপুর, পুরুলিয়া।

ভোটের বাদ্যি বেজে গেছে
সবাই ভয়ে সেঁটে আছে,
বাইক মিছিল দেখলে পরে
ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।
আগে নাকি ভোটের সময়
সবাই পেত আনন্দ
নেতা-মন্ত্রী আসত গ্রামে
পেরিয়ে কত খানাখন্দ।

ভোটের দিনে খুবই মজা
ছোটোরা পেত হাতে গজা,
বড়োরা করত কোলাকুলি
সব পার্টিই মিলিজুলি।
এসব কথা বলতে বলতে
দাদুর চোখ জলে ভরে
ভোটের দিনে কত আনন্দ
এখন তো সব ভয়ে মরে।

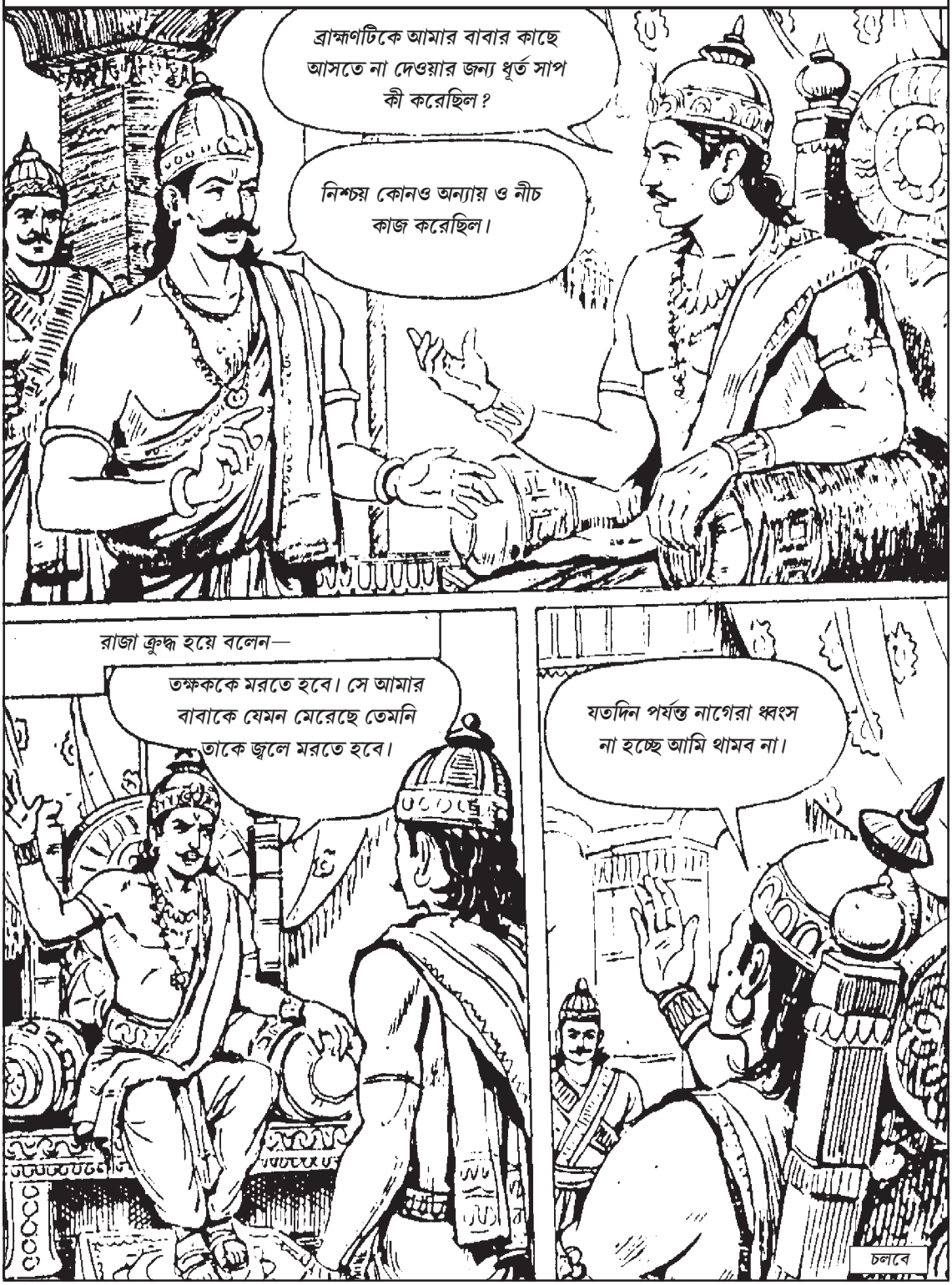
এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ২১।।

একদিন জন্মেজয় মন্ত্রীর কাছে তাঁর বাবার অকাল মৃত্যুর সব কথা শুনলেন। তিনি ক্ষুব্ধ হলেন।



দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও নববর্ষ আবাহন অনুষ্ঠান



গত ১৪ এপ্রিল পূর্বঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহযোগিতায় সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ) প্রান্তের প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও নববর্ষ আবাহন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সল্টলেকের পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহ ভারতীয়ম্-এ। সকাল ১০ টায় মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে সম্মেলনের সূচনা করেন প্রখ্যাত বংশীবাদক পণ্ডিত চেতন জোশী। সম্মেনলে বিভিন্ন পর্বে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর সংস্থাপক পদ্মশ্রী যোগেন্দ্রজী, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আমীর চাঁদ, ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলাক্ষেত্রের সংযোজক অভয় মিশ্র, পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধিকর্তা গৌরী বসু, কত্থক নৃত্যসাধিকা অমিতা দত্ত, ওড়িশি নৃত্যসাধিকা অলকা কানুনগো গৌড়ীয় নৃত্যসাধিকা মহুয়া মুখোপাধ্যায়, লেখক চঞ্চল কুমার ঘোষ এবং সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম সহ সভাপতি গুরু বিশ্বাস ও নীলাঞ্জনা রায়, সংস্কার ভারতীর অন্যতম উপদেষ্টা সুভাষ ভট্টাচার্য এবং ভূঅলংকরণ শিল্পী রঘুরাজ দেশপাণ্ডে। প্রথম পর্বে পণ্ডিত চেতন জোশী বাঁশীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস সচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। শেষে তিনি তাঁর সুমধুর বংশী বাদনে বিভিন্ন রাগগাগিণীর প্রয়োগ প্রদর্শন করেন। এই পর্বের শেষ পর্যায়ে পদ্মশ্রী ড. বিষ্ণু শ্রীধর বাকনকরজীর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাবা যোগেন্দ্রজী বলেন, বাকনকরজী একজন ইতিহাসবেত্তা, চিত্রকর তথা প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন। তিনি সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি মধ্যপ্রদেশের প্রাগৈতিহাসিক ভীমবেটকা গুহা আবিষ্কার করেন। এই পর্বের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম সহ সভানেত্রী নীলাঞ্জনা রায়।

দ্বিতীয় পর্বে শাখানুসারে সমবেত গীত পরিবেশিত হয়। রঘুরাজ দেশপাণ্ডের তত্ত্বাবধানে এবং জয়দেব বণিকের সহযোগিতায় আলপনা কর্মশালা এবং 'বাঙ্গলার নদীকথা' শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বাবা যোগেন্দ্রজী ১৪২৬ বঙ্গাব্দের সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ করন। দেওয়ালপঞ্জীর বিষয় ছিল 'চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রতীক ভারতের গুহা চিত্র'। অনুষ্ঠানের একেবারে শেষে পরিবেশিত হয় নৃত্যগীতি 'নমামি গঙ্গে'। ভাষ্য রচনা অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেন সংস্কার ভারতীর সংগীত গোষ্ঠী। স্তোত্রপাঠে নিত্যানন্দ মুখার্জি, ভাষ্যপাঠে দয়িতা মুখোপাধ্যায় ও সোমা ঘোষ ছিলেন। নৃত্য পরিবেশনায় নৃত্যগুরু অমিতা দত্ত পরিচালিত আনন্দ চান্দ্রকা, নৃত্যগুরু অলোকা কানুনগো পরিচালিত শিঞ্জন নৃত্যালয়, কাবেরী পুইতুণ্ডি(কর) পরিচালিত কৌশিকী, সৌম্য ভৌমিক পতিচালিত গৌড়ীয় চারুকলা ভারতী ও সংস্কার ভারতীর শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠান দর্শকমণ্ডলীকে অভিভূত করে এবং সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

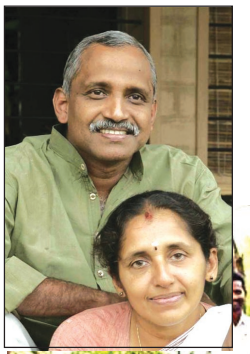
শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে 'কবি কুম্ভ'

'কবিতার মাধ্যমে সবসময় ইতিবাচক বার্তা যাওয়া প্রয়োজন। নেতিবাচক বার্তা ধ্বংসকারী হতে পারে। শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় জ্ঞানবর্ধক ও প্রেরণাদায়ী সংস্থা। এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান রাষ্ট্র, সমাজ এবং সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠার ভাব জাগ্রত করে বার বার সাহিত্যপ্রেমীদের আকৃষ্ট করেছে। আজকের এই আয়োজন সেই পরম্পরারই একটি ধারা। কবি কুম্ভের এই পরিকল্পনা খুবই অর্থবহ।' গত ১৪ এপ্রিল শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় অসোয়াল ভবনে দুটি অধিবেশনে আয়োজিত 'কবি কুম্ভ' অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা বিশিষ্ট কবি কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। অনুষ্ঠানে ৩২ জন বিশিষ্ট কবিকে সম্মানিত করা হয়। তাঁদের অঙ্গবস্ত্র ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীরাম নিবাস শর্মা। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন খড়্গপুর আইআইটি-র রাজভাষা আধিকারিক ড. রাজীব রাওত। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি বংশীধর শর্মা। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. ঋষিকেশ রায় এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ড. সত্যপ্রকাশ তিওয়াড়ী। সমাপ্তি অধিবেশন সঞ্চালনা করেন শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. রাজশ্রী শুক্লা। –

চিকিৎসক দম্পত্তির সেবায় ভালো আছে সিট্টিলিংগি

অন্য রকম





নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কখনও কখনও দু'-একজন ঈশ্বরপ্রেরিত ভূখণ্ডে উপস্থিত হন। ন্যূনতম নাগরিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত সেই ভূখণ্ডে যারা থাকেন, তাদের থাকাকে কোনওভাবেই বেঁচে থাকা বলা চলে না। এই ঈশ্বরপ্রেরিত মানুষেরা সেটা উপলব্ধি করে ভূখণ্ডটিকে বসবাসের উপযোগী করে তোলেন। এমনই দু'জন মানুষের নাম রেজি জর্জ এবং তাঁর স্ত্রী ললিতা। দু'জনেই চিকিৎসক। কিন্তু শহরে মধ্যবিত্তের চিকিৎসা করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করার বাসনা তাঁদের নেই। তাঁরা থাকেন তামিলনাড়ুর সিট্টিলিংগি গ্রামে। পঁচিশ বছর আগে এক চালাঘরে তৈরি করেছিলেন হাসপাতাল। এখন সেখানে লক্ষাধিক জনজাতি ও বনবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের চিকিৎসা হয়।

নয়ের দশকের গোড়ার কথা। তখন রেজি ও ললিতা ডাক্তারি পড়ছেন। পড়াশোনা করতেই করতেই দুজনের আলাপ। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, পাশ করার পর চাকরিও জুটল একই হাসপাতালে। ওই হাসপাতালে দূরদূরান্ত থেকে রোগীরা আসত চিকিৎসার জন্য। বেশিরভাগই ডায়রিয়া নয়তো রক্তাল্পতার রোগী। জর্জ এবং ললিতা দু'জনেই লক্ষ্য করেছিলেন, হাসপাতালে যারা চিকিৎসা করাতে আসেন তাদের অনেককেই ৫০ থেকে ১০০ কিলোমিটার জার্নি করতে হয়। কারণ তাদের গ্রামে তো অনেক দূরের ব্যাপার, কাছাকাছি শহগুলিতেও, চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। বিয়ের পর জর্জ আর ললিতাকে নতুন এক ভাবনা পেয়ে বসল। কী করা যায় ওই মানুষগুলোর জন্য? বস্তুত এই ভাবনাই তাঁদের নতুন হাসপাতাল গড়ার প্রেরণা জোগায়। কিন্তু কোথায় হবে নতুন হাসপাতাল। জায়গা খুঁজতে খুঁজতে একদিন জর্জ আর ললিতা সিট্টিলিংগি গ্রামে এসে, পৌঁছলেন। গ্রামের মানুষ মূলত জনজাতি এবং বনবাসী সম্প্রদায়ের। হঠাৎ কোনও দরকারে হাসপাতালে যেতে হয়। আর যদি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় তাহলে তো সেই বিশেষ হাসপাতাল আরও অনেকটাই দূরে। তাছাড়া এই অঞ্চলে শিশুমৃত্যুর হারও মারাত্মক। প্রতি হাজারে মাত্র দেড়শোজন শিশু বাঁচে। ঠিক হলো এখানেই হাসপাতাল হবে।

সিদ্ধান্ত নেবার পর জর্জ আর ললিতা সিট্টিলিংগিতে থাকতে শুরু করলেন। একটা চালাঘরে হাসপাতাল শুরু হলো। সেসময় একটা একশো ওয়াটের বালভ আর একটা কাঠের বেঞ্চি ছাড়া হাসপাতালের আর কোনও সম্পত্তি ছিল না। জর্জ বলেন, 'আমাদের জমি কেনার টাকা ছিল না। তাই সরকারি জমিতেই হাসপাতাল শুরু করেছিলাম। গ্রামের লোকেরা ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। আমরা তিন বছর ওই ঘরে প্রসূতিদের চিকিৎসা করেছি। ছোটোখাটো অপারেশনও করেছি।'

কয়েক বছর পর বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীদের অর্থ সাহায্যে ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে দশ শয্যার হাসপাতাল। এখন হাসপাতাল পঁয়ত্রিশ শয্যার। একটি অত্যাধুনিক হাসপাতালে যা যা থাকে সবই আছে। জর্জ আর ললিতার দেখাশোনা এবং আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার ফলে শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। এখন প্রতি হাজারে মাত্র কুড়িটি শিশুর মৃত্যু হয়।

কিন্তু এরকম একটি হাসপাতাল চালু রাখতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। কোথা থেকে আসে এত টাকা? জর্জ বলেন, 'রোগীদের কাছ থেকে আমরা সামান্যই টাকা পাই। বেশিরভাগ সময় তাদের কাছে যা থাকে তাই দেয়। না থাকলে দেয় না। আমরাও চাই না। অনেক এন আর আই আছেন যারা আমাদের সাহায্য করেন। দেশেরও বহু লোক টাকা পাঠান।' খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জর্জ কোনও সাহায্য নেন না। তার সেবা কাজের সঙ্গে ধর্মকে জড়াতে চান না বলেই। আরও একটি খবর বেশ চমকপ্রদ। দক্ষিণের গ্রামগুলিতে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ চলে। সিট্টিলিংগি গ্রামে সেই সমস্যা নেই।

জর্জ আর ললিতার কথা শুনলে প্রাথমিক ভাবে রূপকথা বলে মনে হয়। কারণ সারা পৃথিবীতেই চিকিৎসা এখন ব্যবসা। সেখানে লোভনীয় সরকারি চাকরি ছেড়ে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস ছেড়ে গ্রামে গিয়ে হাসপাতাল তৈরি করা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। সেই জন্যেই সিট্টিলিংগিতে জর্জ আর ললিতা ঈশ্বরপ্রেরিত। কারণ জর্জ আর ললিতা শুধু চিকিৎসাই করেন না, মানবসভ্যতার সনাতন মূল্যবোধকেও বাঁচিয়ে রাখেন। একবিংশ শতাব্দীতে এটা কম পাওয়া নয়।

নববর্ষ দখল এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ

স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী

ইদানীং একটা নতুন মত খুব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে বঙ্গাব্দের সূচনা করেন মোগল বাদশা আকবর। এই মতটা বহুদিন ধরেই মূলধারায় আসার চেষ্টা করছিল। বাংলাদেশি মুসলমানদের একটা অংশ এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেও এপার বাঙ্গলায় এর মূল মদতদাতা হলেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এবং অবশ্যই নিজের ইতিহাস না জানা হিন্দু বাঙালিরা। নিজস্ব নববর্ষের এই বিকৃত ইতিহাসই তারা সাদরে গ্রহণ করেছে। বাঙালির লিখিত ইতিহাস না থাকা এবং যেটুকু আছে, সেটুকুও খুব একটা সহজলভ্য না হওয়াতেই বাঙালির মনে নিজের ইতিহাস নিয়ে একটা শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে। এই শূন্যস্থানের সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চাইছে 'আকবর বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা' তত্ত্ব।

বঙ্গাব্দ যে আকবর চালু করেননি, এটা ধরতে পারার জন্য কোনও বড়ো ইতিহাসবিদ হতে হয় না। বোধশক্তি সামান্য প্রয়োগ করলেই এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মিথ্যার পাঁচিল হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়বে। বঙ্গাব্দ অনুযায়ী নববর্ষ পালিত হয় পয়লা বৈশাখ। এই পয়লা বৈশাখ বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে কখনো ইংরেজির ১৪ই এপ্রিল আবার কখনো পড়ে ইংরেজির ১৫ই এপ্রিল। একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নববর্ষের উৎসব পালিত হয়। কেরালাতে যার নাম বিশু, তামিলনাড়ুতে পুথান্ডু, পঞ্জাবে বৈশাখী, অসমে ভাস্করাব্দ শুরুর উৎসবে পালিত হয় রঙালী বিহু, ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে বৈসাগু ইত্যাদি। তো এখন প্রশ্ন হলো, ভারতের এতরকম নববর্ষ একই সময়ে প্রায় একই দিনে পড়ছে কীভাবে, যদি আকবর কেবলমাত্র বঙ্গাব্দ টুকুই চালু করে থাকেন? এবং আরও প্রশ্ন হলো, আকবরের রাজধানী দিল্লির কাছেই পঞ্জাব। অথচ পঞ্জাবের বৈশাখীর প্রচলন করেন আকবর। এমন কোনও মত প্রচলিত নেই। যেখানে দিল্লি থেকে পঞ্জাব অনেক কাছে। তাহলে মোগল বাদশা আকবর ঘরের পাশে পঞ্জাবে বৈশাখী চালু না করে উত্তর ভারত, মধ্যভারত পেরিয়ে সোজা বাঙ্গলায় এসে বঙ্গাব্দ চালু করলেন কেন?



দিল্লির আশেপাশের অঞ্চল দিয়ে শুরু করলেন না কেন? আরও মজার ব্যাপার হলো, দিল্লি এবং তৎসংলগ্ন উত্তর ভারত এবং মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় বর্ষপঞ্জি হিসেবে বিক্রম সংবৎ চালু না করে শুধুমাত্র বাঙ্গলাতেই কেন আলাদা একটা বঙ্গাব্দ চালু করতে গেলেন? বাকি ভারতে কেন নয়? কারণ যে কোনও রাজা যখন কোনও নতুন অব্দ চালু করবেন, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই গোটা রাজত্বে একই অব্দ চালু করবেন। অতএব, নিজের রাজত্বের বাকি অংশের জন্য আকবর রাখলেন একরকম বর্ষপঞ্জি, আর শুধু বাংলার জন্য বানিয়ে দিলেন বঙ্গাব্দ। এটা মারাত্মক রকম কষ্টকল্পনা হয়ে যাচ্ছে না কি?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজা বিক্রমাদিত্যের কথা। বিশাল ছিল তার রাজত্বের পরিসীমা। ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশ এমনকী ইউরোপের কিছু অংশে তাঁর শাসনের সীমা। তবে তাঁর সম্পূর্ণ রাজত্বের জন্য তিনি প্রচলন করেন একটিই বর্ষপঞ্জি, যার নাম বিক্রম সংবৎ। মল্লরাজ আদিমল্ল তাঁর গোটা রাজত্বের জন্য চালু করেন মল্লাব্দ। কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মন তাঁর গোটা রাজত্বের জন্য যে বর্ষপঞ্জি চালু করেন, তার নাম ভাস্করাব্দ। তাহলে আকবর ব্যতিক্রম হবেন কেন? কারণ নিজের রাজত্বের একেক জায়গায় একেক রকম বর্ষপঞ্জি চালু করলে তো রাজকর্মচারীদের পক্ষেও দিন গণনা করা মুশকিল হয়ে উঠবে। এই প্রশ্নগুলো মনে এলেই 'আকবর বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন'-এর ভিত দুর্বল হতে শুরু করে। কারণ এসব প্রশ্নের কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর, 'আকবর বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা' তত্ত্বের তাত্ত্বিকরা এখনো বানিয়ে উঠতে পারেননি।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, আকবর সত্যিই এক নতুন বর্ষপঞ্জি চালু করেন। যার কথা আকবরের সমসাময়িক জীবনী এবং ঐতিহাসিকদের লেখায় রয়েছে। তবে সেই বর্ষপঞ্জির নাম 'তারিখ-ই-ইলাহি'। সেই বর্ষপঞ্জির সঙ্গে এবং তার গণনাপদ্ধতির সঙ্গে বঙ্গাব্দের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই এবং কণামাত্রও মিল নেই। এমনকী আকবরের কোনও জীবনীতে এমন কোনও তথ্য প্রমাণের উল্লেখ নেই যে

ফঃ ৬

আকবর তার রাজত্বের বাকি অংশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বাংলার জন্য একটা আলাদা বর্ষপঞ্জি গঠন করেন, যার নাম বঙ্গাব্দ। আকবর নিজেও নিশ্চয়ই ভাবতে পারেননি, যে তার মৃত্যুর কয়েক শতক পর তার রাজত্বের এক প্রান্তিক ভূখণ্ডের নববর্ষ প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব তিনি পেয়ে যাবেন। আর সেজন্যই আইন-ই-আকবরি'র রচয়িতারাও আকবরের বঙ্গাব্দ প্রতিষ্ঠার প্রমাণ তো দূরের কথা, উল্লেখ মাত্র এইসব বইতে রেখে যাননি। শুধু সেটুকুই নয়, বাঙ্গলা এবং কামরূপের বহু প্রাচীন মন্দিরগাত্রে এবং তাম্রলিপিতে বঙ্গাব্দের উল্লেখ আছে, যেটা আকবরের সিংহাসনে বসার বহু আগের। যেমন পশ্চিমবঙ্গের মৃন্ময়ীমাতার মন্দির ৪০৪ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির শুধু আকবর নয়, বখতিয়ার খিলজিরও আগমনের আগে প্রতিষ্ঠিত। আকবর যদি বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা হন, তাহলে আকবরের বহু শতাব্দী আগের মন্দির গাত্রে এবং তাম্রলিপিতে বঙ্গাব্দের উল্লেখ কোথা থেকে এল?

তবে এসব বাধা আকবর বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতার তাত্ত্বিকদের টলাতে পারেনি। তাদের মতানুযায়ী আকবর দিল্লির সিংহাসনে বসার পরই বঙ্গাব্দ চালু হয়। এই মতের মুশকিল হলো, আকবর সিংহাসনে বসেন ইংরেজি ১৫৫৬ সালে। তার রাজত্ব চলেছিল ১৬০৫ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে ইংরেজি ২০১৯ সাল। যদি ধরে নিই আকবর ১৫৫৬ সালেই বঙ্গাব্দ চালু করেন, তাহলে ইংরেজি ১৫৫৬ সালে হওয়া উচিত ০ বঙ্গাব্দ এবং ইংরেজি ১৫৫৭ সাল হওয়া উচিত বঙ্গাব্দ–১। সেক্ষেত্রে ইংরেজি ২০১৯ সাল হওয়া উচিত ২০১৯ – ১৫৫৬ = ৫৬৩ বঙ্গাব্দ। অথচ আমরা সকলেই জানি ২০১৯ সালের ১৫ই এপ্রিল ১৪২৬ বঙ্গাব্দের শুরু। তাহলে আকবর বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠা করলে, প্রায় হাজার বছরের পার্থক্য আসছে কীভাবে? তখন 'আকবর বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা'-র তাত্ত্বিকরা সব দলে দলে মাথা চুলকাতে লাগলেন। হিসেবের এত বড়ো গোঁজামিল তারা মেলাবেন কীভাবে? তখন তারা নতুন পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। তাঁরা বললেন, মোগল বাদশা আকবর নাকি বঙ্গাব্দ প্রচলন করেন ইসলামের আরব্য নবি হজরত মহম্মদের হিজরতের বছর অনুসারে। হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনার দিকে যাত্রা বা হিজরত করেন ইংরেজি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে। এই হিজরত থেকেই ইসলামি বর্ষপঞ্জি হিজরি গণনা শুরু। অর্থাৎ ৬২২ খ্রিস্টাব্দকে শূন্য বঙ্গাব্দ এবং ৬২৩ বঙ্গাব্দকে বঙ্গাব্দ-১ ধরে আকবর বছর গণনা চালু করেন। তাহলে আমরা যদি হিসেব করি, তাহলে এই বছর হওয়া উচিত ২০১৯ — ৬২২ = ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ। অথচ এটা ১৪২৬ বঙ্গাব্দ। তাহলে প্রায় তিরিশ বছরের পার্থক্য এল কীভাবে?

এবং আরও প্রশ্ন হলো, হিজরত দিয়েই যদি আকবর বঙ্গাব্দ গণনা শুরু করতে চান, তাহলে বঙ্গাব্দের গণনাপদ্ধতি হিন্দু সূর্যসিদ্ধান্ত মতে কীভাবে হলো? যিনি হিজরতের মত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে আস্ত বঙ্গাব্দ চালু করলেন, সেই বঙ্গাব্দের গণনাপদ্ধতির সাথে ইসলামি হিজরি বর্ষপঞ্জির কিছু সঙ্গতি থাকা উচিত। শুধু তাইই নয়, বঙ্গাব্দের মাসের নাম বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এবং বারের নাম সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ইত্যাদি কীভাবে হতে পারে? এই সমস্ত মাসের নাম এবং বারের নাম সারা ভারতের প্রায় সমস্ত হিন্দু বর্ষপঞ্জিতেই এক। হিজরত অনুসারে এ কেমন বর্ষপঞ্জি চালু করলেন আকবর, যার গণনাপদ্ধতি চান্দ্রমাস অনুসারে হলো না, বারের নাম শুক্র-শনি থেকে জুম্মা-আল সাবাত হলো না। মাসের নামও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে মাহে রমজান- রবিউল আওয়াল ইত্যাদি হলো না। বঙ্গাব্দের সমস্ত কিছুই যে ভারতের অন্যান্য হিন্দু বর্ষপঞ্জির মতো রইল, যার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই একই সময়ে তামিল নববর্ষ পুথাণ্ডু থেকে মালোয়ালি নববর্ষ বিশু, কামরূপের নববর্ষ ভাস্করাব্দ ইত্যাদি পড়া। গণনা পদ্ধতি একই রকম না হলে তো আর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এতগুলো হিন্দু নববর্ষ এই একই সময়ে পড়তে পারে না। তাহলে, এ কেমন নতুন বঙ্গাব্দ চালু করলেন আকবর, যার কোনকিছুই বাকি ভারতের অন্যান্য হিন্দু বর্ষপঞ্জির থেকে আলাদা হলো না, সবটুকুই একই রয়ে গেল? কিছু যদি নাই পাল্টায় তাহলে হিজরতের অনুপ্রেরণায় আলাদা বর্ষপঞ্জি তৈরির মানে কী?

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, গোঁজামিল ইতিহাস দিয়ে সহজ সরল অঙ্কের হিসেব বা যুক্তির হিসেব, কোনটাই মিলছে না। তাহলে আসল সত্যি কী? কে করলেন বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠা? এর উত্তর দিতে গিয়ে আমরা আবার অঙ্কের হিসেবে ফিরে যাব। এতক্ষণে এই ব্যাপারটুকু নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে গেছে, যে ইংরেজি বছর এবং বাংলা বছরের মধ্যে অনেক বছরের ফারাক আছে। সেটা কত বছর? ২০১৯ – ১৪২৬ করলে পাই ৫৯৩ সাল। অর্থাৎ বাংলা বর্ষপঞ্জি চালু হয় ৫৯৩ সাল নাগাদ। এই সময়ে এমন কেউ বাংলার সিংহাসনে বসেন, যিনি এই বর্ষপঞ্জি চালু করেন। ইতিহাস বলছে, ওই বছরই বহু খণ্ডে বিভক্ত বাংলাকে একত্রিত করে সিংহাসনে বসেন মহারাজ নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্ক। মহারাজ শশাঙ্ক ছিলেন ঘোর শৈব, তাই শৈবদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার সোমবারে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিসেব করলে দেখা যায়, প্রথম বঙ্গাব্দের শুরুর দিনটিও ছিল সোমবার।

'আকবর বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা', এই মতের প্রধান প্রবক্তা হলেন বাংলাদেশের শামসুজ্জামান খান, সৈয়দ আশরাফ আলি, সিরাজুল ইসলাম, আহমেদ জামাল প্রমুখ। এনাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আকবরকে বাদ দিয়ে আলাউদ্দিন হুসেন শা-কে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বলে মত দিয়েছেন। এখানে মনে রাখা দরকার, হুসেন শাহের রাজত্বকালে ইংরেজি ১৪৯৪ থেকে ইংরেজির ১৫১৯ সাল পর্যন্ত। ইনি বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হলে বঙ্গাব্দের বয়স ৫০০ বছরের বেশি হবে না। তাহলে কেন বাংলাদেশের মুসলমান ঐতিহাসিকরা বারেবারে এরকম অবাস্তব দাবি তুলছেন? কেন তারা বাঙ্গলার ভূমিপুত্র নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্ককে বাদ দিয়ে বঙ্গাব্দ প্রতিষ্ঠার সম্মান তুলে দিতে চান অবাঙ্গালি আকবর কিংবা

বহিরাগত হুসেন শাহের হাতে? তারা কি বাঙ্গালির ক্ষমতার উপর এতটুকু আস্থা রাখতে পারেন না, যে কোনও বিদেশি বহিরাগতর সাহায্য ছাড়াই বাঙ্গালি নিজেই নিজের বর্ষপঞ্জি তৈরি করতে পারে? কারণ সেক্ষেত্রে আকবর বা হুসেন শা আসার আগে, বাঙ্গালির এতকাল যাবৎ চাষবাস, পূজার্চনা, বিয়ে, পারলৌকিক কাজ ইত্যাদি বর্ষপঞ্জি ছাড়াই কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল? যেখানে বাংলার বিভিন্ন অংশে আকবরের বহু শতাব্দী আগে থেকেই নানান বর্ষপঞ্জি প্রচলিত। মল্লাব্দ, বুদ্ধাব্দ, বঙ্গাব্দ, চৈতন্যাব্দ ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবেই বাঙালির সৃষ্ট বর্ষপঞ্জি। বাঙ্গালিকে কৃতিত্ব দিতে কিসের এত অনীহা বাংলাদেশের শ্যামসুজ্জামান-সিরাজুল-আহমেদ জামালদের? যে বাঙালি জাতির বয়স পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি, নিজেদের জন্য সামান্য একটা বর্ষপঞ্জিও তারা তৈরি করতে পারবে না, এমন কথা এরা ভাবলেন কীভাবে?

একটু তলিয়ে ভাবলেই বাংলাদেশের ঐতিহাসিকদের আকবর বা হুসেন শা-কে বঙ্গাব্দ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে দেবার মরিয়া চেষ্টার কারণটা বোঝা যায়। খুব বেশি দশক আগের কথা নয়, যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এরশাদ বাঙালির চিরাচরিত বর্ষ গণনা পদ্ধতিকে উলটেপালটে একটি নতুন কৃত্রিম বর্ষগণনা পদ্ধতি আবিষ্কার করে সেটিরও নাম রাখেন বঙ্গাব্দ। এবং এই কৃত্রিম বঙ্গাব্দকে 'বাংলাদেশের জাতীয় বর্ষপঞ্জি' হিসেবে ঘোষণা করেন। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯২ ভাগ মুসলমান, যাদের প্রধান উৎসব হল ঈদ, মহরম, ফতেহা দোয়াজ দাহম ইত্যাদি। এখন বাংলাদেশে কি এই ঈদ, মহরম এরশাত রচিত কৃত্রিম বঙ্গাব্দ অনুসারে গণনা হয়? উত্তর হলো না। বাংলাদেশে ঈদ, মহরম ইত্যাদি সবই হিজরি গণনা পদ্ধতি অনুসারে হয়। উরস, ইজতেমা কি বঙ্গাব্দ অনুসারে গণনা হয়? বাংলাদেশের ৯২ শতাংশ তাদের সন্তানের আকিকা বা সুন্নত, নিকা কিংবা কবর জিয়ারত কি বঙ্গাব্দ দেখে



বঙ্গাব্দ নামটুকু থাকবে, কিন্তু তার চিরচরিত গণনাপদ্ধতি পালটে দেওয়া হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। বঙ্গাব্দ থাকবে, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে থাকবে কোনও মোগল-পাঠানের নাম। তবেই তো হিন্দু বাঙ্গালির কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে তার নববর্ষ।

করেন? আজ্ঞে না, বাংলাদেশের ৯২ শতাংশের কোনও কাজেই লাগে না বঙ্গাব্দ। তাহলে কি কারণে এরশাদ বঙ্গাব্দ-র গণনাপদ্ধতি পালটে দিলেন? বঙ্গাব্দ অনুসারে পূজা-পার্বণ গণনা করেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজ। শিশুর নামকরণ থেকে হাতেখড়ি, বিয়ে থেকে শ্রাদ্ধ, পুজো-পার্বণ থেকে গৃহপ্রবেশ এবং তর্পণ, সবটাই হয় বঙ্গাব্দ মেনে। তবে কি তাদের পূজা-পদ্ধতিতে ব্যাঘাত ঘটানোর উদ্দেশ্যেই 'বঙ্গাব্দ সংস্কার'-এর নামে এরশাদের এই নববর্ষ দখলের প্রচেষ্টা? আর সেই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই কি বাংলাদেশের সিরাজুল-আশরাফ আলি-শামসুজ্জামানরা যেনতেনপ্রকারে বঙ্গাব্দের ইতিহাস থেকে হিন্দু বাঙ্গালির নামগন্ধটুকু মুছে দিতে চান? বঙ্গাব্দ নামটুকু থাকবে, কিন্তু তার চিরচরিত গণনাপদ্ধতি পালটে দেওয়া হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। বঙ্গাব্দ থাকবে, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে থাকবে কোনও মোগল-পাঠানের নাম। তবেই তো হিন্দু বাঙ্গালির কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে তার নববর্ষ। নববর্ষ দখল সম্পূর্ণ হলে বাংলাদেশের গ্রাসে যাবে হিন্দু বাঙ্গালির এক অমূল্য ইতিহাস।

তাই বাঙ্গালিকে সবসময় সজাগ থাকতে হবে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। আমাদের নববর্ষ, আমদের সংস্কৃতির অমূল্য অংশ। বাঙ্গালির লিখিত ইতিহাস চাই, বাঙ্গালির ইতিহাস খুব সহজলভ্য হওয়া চাই। যে জাতির ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যত দুর্লভ হয়, সেই জাতির ইতিহাস বেদখল হবার সুযোগ তত বাড়ে। উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে। নিজের নববর্ষের প্রতিষ্ঠাতাকে নিয়ে হিন্দু বাঙ্গালির অজ্ঞানতাকে কাজে লাগিয়ে আকবরকে বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা বানাতে চায় একদল সাংস্কৃতিক আগ্রাসী। আর এদেরকে যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছে এপারের কিছু বাঙ্গালি-ঘরশত্রু। এই আগ্রাসন ঠেকাতে চাই নিজের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের ক্রমাগত স্মরণ। ভুলে যাবেন না, কোনও বিদেশি বাদশা নন, বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বাংলার ভূমিপুত্র রাজা শশাঙ্ক। এই ভয়ানক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের দিনে, যখন মিডিয়ায়, ওয়েবসাইটে, খবরে, ইউটিউবে ক্রমাগত মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে বঙ্গাব্দের নামে, তখন বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা শশাঙ্কের নাম মনে রাখা এবং এই তথ্যটিকে সমস্ত চেনা পরিচিতের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াটাই হল বাঙ্গালির 'সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ'। এই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের অঙ্গীকার দিয়েই শুভ ও মঙ্গলময় হোক বঙ্গাব্দ। ■

কর্মহীন মানুষকে অর্থ সাহায্য দিয়ে দারিদ্র্য দূর করা যায় না

অতিথি কলম



মণীশ সাভারওয়াল

১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধে পাক সেনাধ্যক্ষ জেনারেল নিয়াজি এক সম্পূর্ণ অসহায় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ৯৩ হাজার সৈন্যের বিশাল সংখ্যা নিয়ে তিনি ভারতের কাছে চরম অবমানাকর আত্মসমর্পণ করেন। এই ঘটনা পাকিস্তানের কাছে চির কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে রয়ে গেছে। তবে তাঁর বলার জায়গা ছিল এটাই যে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও আক্রমণাত্মক পূর্ব পাকিস্তানিদের মোকাবিলায় তাঁর সৈন্যের কোনো রসদ ছিল না আর তারা ছিল বহু দূরে। এই পরিস্থিতিতে টিকে থাকা ছিল অসম্ভব। তিনি আত্মসমর্পণ ছাড়া কোনো বিকল্প খুঁজে পাননি। কিন্তু এই মানদণ্ডে ভারতের দারিদ্য দূরীকরণ কিন্তু আদৌ অসম্ভব কোনো দায় নয়। যার ফলে গরিবদের কোনো কাজের সংস্থান ছাড়াই 'ন্যায়' নামাঙ্কিত প্রকল্পে তাদের চিরকালীন দান দিয়ে সমস্যার সমাধান করা হবে। এর পরিণতিতে আমাদের দেশে সুযোগের যে পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে তা অব্যবহারে ধ্বংস হয়ে যাবে। ভাবা দরকার, ভারত এখনও দরিদ্র কেন? ইংরেজ আমলের বহু আগে থেকেই আমাদের এখানে উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হওয়ার (রাজরাজড়ার মাধ্যমে) ট্রাডিশন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও কী করে আমরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এত সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ এত শক্ত কাজ করতে পারলেও দেশের অর্থনীতিকে কেন বিশ্বের সর্ববৃহৎ করতে পারিনি? না, ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলা যাবে না কেন ১৩০ কোটি মানুষের দেশের পক্ষে ৭ কোটি মানুষের দেশ ব্রিটেনের জিডিপি-কে অতিক্রম করতে ৭২ বছর লাগল। এই সূত্রে প্রাচীন হিসেব মতো Hindu rate of growth হালে ১৯৯১ সালে শতকরা ২ থেকে ৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ভারতে তবু দারিদ্র্য রয়েছে। এর মূল কারণ স্বাধীনতার পরের অসাধারণ অর্থনৈতিক নীতির অনুসরণ যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাজনীতির মিশেল। প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসাকে কোনো উৎসাহ দেওয়া হয়নি। উৎসাহ দেওয়া হয়নি উদ্যোগপতি তৈরি করার ওপর আর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টা তো ছিল সিলেবাসের বাইরে।

বহু ভারতীয় অত্যন্ত কম উৎপাদনশীলতার পরিবেশে কাজ করেন। কর্ণাটক উত্তরপ্রদেশের তুলনায় মাত্র এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিয়েও মাথাপিছু উৎপাদনশীলতায় এগিয়ে রয়েছে। দেশের ৫০ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ কৃষিকাজ করলেও সামগ্রিক জিডিপি-তে কৃষির অবদান মাত্র ১৪ শতাংশ। অন্যদিকে আই টি সেক্টরে মাত্র ০.৭ শতাংশ লোক নিযুক্ত থাকলেও জিডিপি-তে এঁদের অবদান ৮ শতাংশ। অন্যদিকে কলকারখানার ক্ষেত্রে আমাদের ৬ কোটি ৩০ লক্ষ উদ্যোগের মধ্যে মাত্র ১৯৫০০ কোম্পানির মূলধন ১০ কোটি, এখানেও কম উৎপাদনশীলতার বিষয়টি রয়েছে। অত্যন্ত উদ্বেগজনকভাবে আইটিআই থেকে প্রশিক্ষিত প্রয়োগকর্মীদের যাঁরা চাকরিতে ওপরে দিকে উঠেছেন তাঁদের ১০ শতাংশের মাইনে তথাকথিত ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা যাঁরা সংস্থার নীচের স্তরে চাকুরিরত তাঁদের থেকে বেশি। অর্থাৎ প্রয়োগ কুশলতা বা উৎপাদনশীলতায় তাঁরা পিছিয়ে আছে।

> ভারতবাসী বিশ্বাস করে একটা সুস্থ কর্ম নিযুক্তি থেকে সে শুধু টাকা রোজগার করে না। সে রোজগার করে তার আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস, সৃষ্টি করে নিজস্ব পরিচয় ও বাড়তি দক্ষতা। তাই বিশাল সংখ্যক মানুষকে কর্মহীন রেখে তাকে দানের টাকা দিয়ে যাওয়া দেশ সম্পর্কে এক অন্তহীন আতঙ্কিত নিরাশার সৃষ্টি করবে। আর সেই অর্থে দেশের মানুষও তাদের আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়েও বিশ্বব্যাপী হতাশাজনক ভাবমূর্তি তৈরি হবে।

এই নিশ্চিত আয় প্রকল্পের ভাবনা স্ক্যানডিনেভিয় ছোটো ছোটো সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দেশ থেকে প্রভাবিত। মনে রাখতে হবে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের ব্যবসা পরিচালনার স্বাচ্ছন্দ্যের হিসেবে ১৯০টি দেশের মধ্যে ডেনমার্ক তিনে। নরওয়ে ৭ বা সুইডেন ১২ নম্বরে রয়েছে। তাদের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সাফল্য অনেকটাই জড়িয়ে আছে সেখানকার মুক্ত অর্থনীতির ওপর। যেখানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ, আইন কানুনের প্রয়োগ ন্যূনতম। এই আইনি বেড়াজালের প্রভাব আমাদের কৃষিক্ষেত্রের দুর্দশার ওপরও পড়েছে। দেশে চাষিকে বাঁচাতে হলে তাদের একটা অংশকে কৃষিক্ষেত্র থেকেই তুলে নেওয়া জরুরি। কিন্তু অকৃষি ক্ষেত্রে কাজের পর্যাপ্ত সংস্থান না থাকাটা বড়ো সমস্যা।

ধনী দেশগুলির ক্ষেত্রে আয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যাতে তারা দারিদ্র্যের জালে না পড়ে। কিন্তু ভারতের মতো দেশ যেখানে মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করে

নেওয়ার সফল প্রয়াস চলছে তা এখানে কখনই প্রয়োগ হতে পারে না। আমরা উৎপাদনশীলতার মানদণ্ডে পিছিয়ে। উপযুক্ত উপকরণও সব সময় উপলব্ধ নয়, তাই চোখ কান বুঝে পাশ্চাত্যের অনুকরণ আমাদের আধুনিক করে তুলতে পারে না। ১৯৫৫ সালে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন আমাদের জাতীয় আয় না বাড়লে আমরা কিছুতেই কল্যাণ রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারব না। আমাদের হাতে এমন সম্পদ নেই যে তা আমরা সকলের মধ্যে সহজেই বিতরণ করে দিতে পারে। হ্যাঁ, কেবলমাত্র দারিদ্র্যই আছে যা ভাগ করে দেওয়া যায়। এই কারণেই আমাদের অর্থনীতির অভিমুখ এমনটাই হওয়া উচিত যা আমাদের দেশে প্রাচুর্য এনে দেবে।" এই বিশ্লেষণের নিরিখে তিনি বেঁচে থাকলে মেনে নিতেন যে প্রস্তাবিত 'নিশ্চিত আয়' প্রকল্পে ৪ লক্ষ কোটি টাকা ভরতুকি না কমিয়ে বা বিপুল মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে বা আয় করের হার না বাড়ালে দেশের অর্থনীতির পক্ষে বড়ো বিপদ ডেকে আনবে।

দারিদ্র্য কিন্তু ক্যান্সার নয় যে প্রত্যেকটি দূষিত সেলকে বাদ না দিলে তা আবার ফিরে আসবে। বরঞ্চ দারিদ্র্যকে বেশি ওজনের লোকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ওজন কমানোর প্রক্রিয়াটা খুব কঠিন ও দীর্ঘকালীন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই জারি রাখলে ধীরে হলেও ওজন কমার মতো দারিদ্র্যও কমে আসবে। কালক্রমে খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়াম যেমন জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে উঠে, শরীরকে স্বাস্থ্যবান করে তুলতে নানা কাজে সক্ষমতা এনে দেয়। দারিদ্র্য থেকে ধীরে নিজ প্রচেষ্টায় বেরিয়ে আসা মানুষও দেশের সম্পদ হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখবে।

এ কাজে সাফল্য পেতে গেলে এমন একটা অর্থনীতি দরকার যেখানে পরিকাঠামো উন্নয়নে থাকবে গুরুত্ব, যা উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর সহায়ক হবে, মুদ্রাস্ফীতি থাকবে নিম্নমুখী, সরকারি নিয়মের বেড়াজাল শিথিল হবে, বাড়াতে হবে ফর্মাল সেক্টর, বৃদ্ধি ঘটাতে হবে করদাতার সংখ্যা, গড়ে তুলতে হবে আরও শহরাঞ্চল। অবশ্যই উৎপাদন ক্ষেত্র বাড়িয়ে সেখানে নিয়োগ বড়ো গুরুত্বের। টাকা লেনদেনে digitisation কালোটাকা সৃষ্টিতে বড়ো বাধা হয়ে উঠবে। বলার বিষয় অনেক সেগুলিই উন্নত দেশের লক্ষ্যে অগ্রসরমান একটি দেশের সামগ্রিক শাখা পরিচালনার অগ্রাধিকার।

আর একটা অদৃশ্যমান জিনিসকে ভুললে চলবে না। ভারতবাসী বিশ্বাস করে একটা সুস্থ কর্ম নিযুক্তি থেকে সে শুধু টাকা রোজগার করে না। সে রোজগার করে তার আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস, সৃষ্টি করে নিজস্ব পরিচয় ও বাড়তি দক্ষতা। তাই বিশাল সংখ্যক মানুষকে কর্মহীন রেখে তাকে দানের টাকা দিয়ে যাওয়া দেশ সম্পর্কে এক অন্তহীন আতঙ্কিত নিরাশার সৃষ্টি করবে। আর সেই অর্থে দেশের মানুষও তাদের আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়েও বিশ্বব্যাপী হতাশাজনক ভাবমূর্তি তৈরি হবে। অবশ্যই এই চিত্রকল্প বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির'-এর কল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ বিষয়ে নিরাশাবাদীদের কথাবার্তা কিন্তু আপনাদের হিতকারী বলে মনে হতে পারে, কেননা তাদের বক্তব্যে আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস আছে। কিন্তু আশাবাদীদের বক্তব্যে রয়েছে আপনাকে কোনো কিছু বিক্রি করার এককালীন কৌশল। আমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন wall street কাগজের প্রথম পাতায় একবার বেরিয়েছিল ভারত যতটা না ইম্পোর্টেন্ট তার থেকে অনেক বেশি ইম্পোর্টেন্ট একটা দেশ। সেই সাংবাদিক নিশ্চিত তার এই খেলো মন্তব্য এতদিনে গিলে ফেলেছেন। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক গতিবিধির অন্যতম সূচক 'শেয়ার বাজার' যা ভারতে ডলারের নিরিখে নাগাড়ে সেরা বৃদ্ধির স্থান ধরে রেখেছে বিগত ২৫ বছর ধরে।

মনে রাখা দরকার, শেয়ার বাজার কিন্তু বর্তমানের থেকে ভবিষ্যৎকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাই তার কেনা-বেচা, লগ্নির মানদণ্ড। শেয়ার বাজার আশা করে ভারত বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধির অর্থনীতির গৌরব ধরে রাখবে। বিশ্বের অর্থনীতি বিশারদরা বুঝতে পারছেন উৎপাদনশীলতায় পিছিয়ে থাকাটা ভারতে এক যুগ বা এক শতাব্দীর বিষয় হয়তো ছিল কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাটা কিন্তু দেশের পক্ষে চিরস্থায়ী হতে চলেছে। অনতিবিলম্বে ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতির পরিধি জাপান, ফ্রান্স, জর্মানিকে অতিক্রম করে যাবে।

তাই আবারও বলছি পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার যে ভাবে লেগে আছে আরও দৃঢ়ভাবে তাতে মনোনিবেশ করাটাই হবে সুযোগের সদ্ব্যবহার। দয়ার দান দিয়ে মানুষকে চির কর্মহীন করে রাখাটা কোনো কথাই নয়। ▌

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

Email : swastika 5915@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

৭০-এর দশকে ডাঃ অন্নপূর্ণা ব্রিটেন কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রত্যেকটি বেবিফুডের টিনে দীর্ঘদিন ধরেই 'শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধই সেরা' সতর্কবাণীটি আবশ্যিকভাবে লেখা থাকত। ৭০-এর দশকের শুরুতে কিন্তু এমনটা ছিল না। সারা বিশ্বের মায়েরা তাঁদের সন্তানদের সর্বশ্রেষ্ঠ পোষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এখন সজাগ হয়ে যান। এই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ থাকবেন শ্রীমতী অন্নপূর্ণা শুক্লার কাছে। ডা: শুক্লা মাতৃদুগ্ধের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে তাঁর গবেষণা শুরু করেছিলেন লন্ডনে ৬০-এর দশকের শেষে। শিশুর পুষ্টির ওপর তিনি পিএইচডি করেছিলেন ব্রিটেনের Worcestershire থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে। তাঁর সহযোগী ডাক্তাররা ছিলেন HA Forsyth, M Anderson প্রমুখ। চিকিৎসকের নির্দিষ্ট মাপকাঠি শিশুর ক্ষেত্রে তার কাঙ্ক্ষিত ওজন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে ড. অন্নপূর্ণা প্রমাণ করেন মাতৃদুগ্ধে লালিত শিশুদের বাড়বৃদ্ধি অন্যদের তুলনায় বেশি



কিন্তু মোটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। ডাঃ শুক্লা জানান তাঁর গবেষণাপত্র প্রথমে বিশ্বের সর্বাধিক সমাদৃত ও প্রামাণ্য ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয়। পরে এর বর্ধিত রূপ পিএইচডি থিসিসের মান্যতা পায়। এর পর থেকেই প্রথমে ব্রিটেনের সমস্ত বেবিফুড উৎপাদনকারী সংস্থা ও পরে সারা বিশ্বের শিশু খাদ্য উৎপাদনকারীরা এই আবশ্যিক সতর্কবাণী বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যবহার করে আসছে। এই বিরল প্রতিভাময়ী ডাক্তার অন্নপূর্ণা শুক্লাই বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রার্থীপদের অন্যতম উত্থাপক। তিনি নামাঙ্কন কেন্দ্রে আসা মাত্রই ৯১ বছরের অন্নপূর্ণাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন প্রধানমন্ত্রী। আশীর্বাদ করে ডাঃ শুক্লা তাঁকে বলেছেন, 'উঁচে শিখর পর যাওগে' (অনেক শীর্ষে তুমি উঠবে)। এই নামাঙ্কনের উত্থাপক না হলে তাঁর মতো একজন বিরল প্রতিভার নারীর শিখর ছোঁয়ার কাহিনিটিও নেপথ্যেই থেকে যেত।

কোর্টের শুনানির সময় ঘাবড়ে গিয়ে জেল কুঠরিতে আটকে নীরব মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত সপ্তাহে পলাতক হিরে কারবারি নীরব মোদী তাঁর জেলবন্দি অবস্থা থেকে ছাড়া পেতে জামিনের আবেদন করেছিলেন। বিলেতের নিয়ম অনুযায়ী বন্দিকে সশরীরে আদালতে না এনে আজকাল ভিডিও, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আবেদনের নিষ্পত্তি হয়। সংবাদে প্রকাশ, নীরবের আবেদন নাকচ হওয়ার পর তাঁকে আরও ২৮ দিন জেলে রেখে ২৪ মে আবার শুনানির আদেশ হয়। এরপর মুখ্য ম্যাজিস্ট্রেট এসা আরমুখনাটের বয়ান অনুযায়ী আগামী ৩০ মে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট হেয়ারিংয়ের দিন ধার্য হয়েছে। প্রথামত ওই দিন মোদীর তরফে যা কিছু প্রমাণ, দলিল, দস্তাবেজ আদালতে পেশ করতে হবে। ব্রিটেনের ২০০৩ সালে প্রত্যার্পণ আইন অনুযায়ী যে ব্যক্তি জেলে বন্দি অবস্থায় জামিনের আবেদন করেন তাঁদের ২৮ দিন অন্তর বিচারপতির কাছে বাধ্যতামূলক হাজিরা দিতে হয়। এই শুনানির মেয়াদ সাধারণত কয়েক মিনিট যদি না দু'পক্ষের কেউ বিচারপতির কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না তুলে ধরে।

এদিনও আদালতে নীরবের আইনজীবীরা বিচারপতির মুখোমুখি হন ও নীরবকে ভিডিও লিঙ্কে দেখানো হয়। নিয়ম অনুযায়ী একজন বন্দির শুনানি শেষ হলেই শুনানি কক্ষে অন্য বন্দিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যাতে বিচারপতি তাঁকে দেখতে পান। এদিন জামিন নাকচ হওয়ার পর হতভম্ব নীরব বন্দি শুনানি কক্ষেই দাঁড়িয়ে থাকেন। বিচারক অবাক হয়ে জানতে চান 'Oh, you are still here, imediately ger out' নীরব জানান I can not get out।

বিচারক তাঁকে নিরাপত্তা কর্মীদের ডাকতে বলেন। হতচকিত নীরব সে কাজেও ব্যর্থ হন (হয়তো গলা দিয়ে আওয়াজ পেরোয়নি)। এরপর টেলিভিশনে তাঁকে জেল কক্ষে আতঙ্কিত ভাবে পায়চারি করতে দেখা যায়। শেষমেশ আদালত থেকে আপৎকালীন বোতাম টিপে নিরাপত্তা কর্মী ডেকে পলাতক নীরবকে তখনকার মতো শুনানি কক্ষ থেকে বার করে তাঁর কুঠরিতে ঢোকানো হয়। প্রসঙ্গত, এর আগের আবেদনে নীরবের ৯ কোটি টাকার জামিনদার দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও আদালত নাকচ করে দেয়। কেননা, আদালত জানতে পারে তিনি vanuatu বলে একটি ছোটো দ্বীপে পালাবার ও নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য ১৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকার সওদা করছেন। শুধু তাই নয় তাঁর অপকর্মের এক সাক্ষীকে খুন করার হুমকিও তিনি দিয়েছেন এমন তথ্যও আদালতের হাতে রয়েছে। সুতরাং এমন আরও এক মাস জেল বাস। একেই বলে ঠ্যালার নাম বাবাজী।

দিব্যাঙ্গদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করাই সরকারের লক্ষ্য : উপ-রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু নতুন দিল্লিতে পুষ্পবিহার আয়াপ্পা সেবা সমিতি আয়োজিত 'মিরাকেল অন হুইলস্' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কলাকুশলীদের প্রশংসা করে বলেন, বহুমুখী মেধা ও প্রতিভাসম্পন্ন এই শিল্পীরা সমগ্র বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোনও অক্ষমতাই তাঁদের উৎসাহে ঘাটতি হতে দেবে না বা তাঁদের মাসিকতাকে দমন করতে পারবে না।



পুষ্পবিহার আয়াপ্পা সেবা সমিতি সমাজ সেবা ও সর্বজনীন কল্যাণে যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তার প্রশংসা করে শ্রী নাইডু বলেন, সর্বজনীন কল্যাণের মানসিকতাই ভারতের সামাজিক মূল্যবোধের মৌলিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। ভারতীয় দর্শনের মূল বিষয়বস্তুই হলো 'সর্বে ভবন্তু সুখীন'।

বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সে প্রসঙ্গে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, দিব্যাঙ্গদের কল্যাণে এবং মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনে তাঁদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সরকার ও সমাজের সমান দায়িত্ব রয়েছে।

শ্রী নাইডু বলেন, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের করুণা, প্রেরণা, সংবর্ধনা এবং অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। দিবাঙ্গদের ক্ষমতায়নে প্রথম পদক্ষেপই হলো তাঁদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রবণতা দূর করা। 'সমাজের একজন হিসাবে আমাদের এটা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, দিব্যাঙ্গদের বিরুদ্ধে কোনও ধরণের সামাজিক কলঙ্ক যাতে জুড়ে দেওয়া না হয়।

উপ-রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, ভারত সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক সমৃদ্ধ দেশ, এতে 'আমরা গর্ববোধ করতে পারি'। তিনি সকলের প্রতি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রসারের আহ্বান জানিয়ে বলেন, সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক ঐতিহ্যের মধ্যেই শান্তি, করুণা এবং সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলার মূল বার্তা লুকিয়ে রয়েছে।

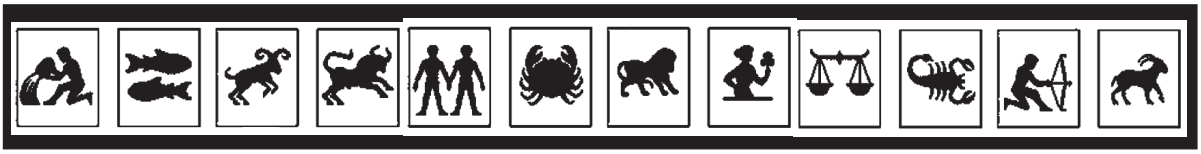
প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে স্বতন্ত্র পারদর্শিতা রয়েছে, তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে শ্রী নাইডু পুষ্পবিহার আয়াপ্পা সেবা সমিতির প্রশংসা করে বলেন, প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের উদ্যোগ মানুষের জীবনের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।

জলসম্পদ প্রকল্পে টেকনিক্যাল টেক্সটাইলের ব্যবহারের সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রকের উদ্যোগে সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে জলসম্পদ প্রকল্পে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার বিষয়ে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। কয়েক দশক ধরেই সারা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন কাজে এই ধরনের তন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের জলসম্পদ প্রকল্পের পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সিভিল এবং জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা অভিনব এই বস্তুটি ব্যবহার করে থাকেন। এই ধরনের কৃত্রিম তন্তু পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল এই উভয় দেশেই তৈরি এবং ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভারতে ঘাতসহ, স্বল্প মূল্যের পরিবেশ-বান্ধব এই বস্তুটির তেমন একটা ব্যবহার নেই। অথচ, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতি বছর প্রবল বন্যা ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে থাকে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের ক্ষেত্রে কৃত্রিম তন্তু দ্বারা নির্মিত পাইপ, জলাধার এবং ব্যাগ বিশেষভাবে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই বস্তুটির জল শোষণ ক্ষমতা, স্থিতিস্থাপকতা এবং সহজে জলের নীচে ব্যবহারের সুবিধার নিরিখে এটি এমনকি কংক্রিকেটের থেকেও ভালো কাজ করে।

জলসম্পদ ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে এই অভিনব বস্তুটির ব্যবহারের সম্ভবনা নিয়ে এই সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা মতবিনিময় করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, বিভিন্ন রাজ্যের জলসম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-গবেষক-শিক্ষক, বিভিন্ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার, উৎপাদনকারী, বিপণকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা আজকের এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। আয়োজক মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রী এন. কে. মাথুর, কেন্দ্রীয় জল কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীমতী টি রাজেশ্বরী সহ উচ্চ পদস্থ সরকারি আধিকারিকরা এই সেমিনারে অংশ নেন। এই উপলক্ষে কৃত্রিম তন্তু ব্যবহারের বিষয়ে একটি ম্যানুয়ালও প্রকাশ করা হয়।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



৬ মে (সোমবার) থেকে ১২ মে (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে রবি, বুধ, বৃষে মঙ্গল, মিথুনে রাহু, বৃশ্চিকে বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, মীনে শুক্র। ৭ মে, মঙ্গলবার সকাল ৭-৫২ মিনিটে মঙ্গলের মিথুনে প্রবেশ। পুনরায় ১০ মে, শুক্রবার, বৈকাল ৩-৪৫ মিনিটে শুক্রের মেষে পদার্পণ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃষে কৃত্তিকা নক্ষত্র থেকে কর্কটে অশ্লেষা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ চিন্তা ও বুদ্ধির বাস্তবায়ন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও দায়িত্ববোধের স্বাক্ষর রাখবেন। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় বিশেষ যোগাযোগ। গৃহ, বাহন, বস্ত্র, অলংকার, সুখাদ্য ভোজন ও বিলাসতায় বিনিয়োগ, তৃপ্তি ও আনন্দ। বিদ্যার্থী ও গবেষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ও শংসা। গুরুজনের পরামর্শে নতুন দিশার সন্ধান। পুরানো বন্ধুর সঙ্গে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা।

বৃষ ঃ কর্মক্ষেত্রে চাপ ও ব্যস্ততায় শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি, অবসাদ। সন্তানের পড়াশুনায় জেদভাব পরিহার করা দরকার। পারিবারিক শান্তির দিকে নজর দিন। জীবন সঙ্গিনীর দূরদর্শিতায় সাংসারিক সমৃদ্ধি। নিকটজনের বিবাহের অনুষ্ঠান। ভালো কাজ করে বদনাম পাওয়ার সম্ভাবনা, মিত্র সান্নিধ্যে মানসিক প্রশান্তি। আর্থিক শুভ।

মিথুন ঃ কর্মক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা আর্থিক সাফল্য সাবলীলতা বজায় রাখবে। বিতর্কিত মন্তব্য ও চিন্তা চেতনায় দোদুল্যমানতা পরিহার করুন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সখ্য ও ব্যবসায় নব উদ্যোগে বাস্তবায়ন। মুখমণ্ডলের চোট-আঘাতে সতর্কতা প্রয়োজন। সমাজকল্যাণে সক্রিয়তায় বিশিষ্টজনের সান্নিধ্য ও তৃপ্তি। ভ্রাতা-ভগ্নীর কোনো সুখবর আনন্দের ও গর্বের।

কর্কট ঃ আর্থিক পাওনা আদায়ে বিলম্ব হলেও ফাটকায় প্রাপ্তি শুভ। কর্মক্ষেত্রে জটিলতার অবসানে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় হবে। প্রতিবেশীর আচরণে ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত মন। মাতুল সম্পর্কিত কারও স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগ। আবার পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রশস্ত। অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তা ও সঞ্চয় যোগ।

সিংহ ঃ মনঃসংযোগ ও অধ্যবসায়ের অভাব হেতু বিদ্যার্থীর আশারূপ ফললাভে প্রতিবন্ধকতা। প্রমোটিং, দালালি, ইমারতি কেনাবেচা ব্যবসায় ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যোদয়। সম্পত্তি ও কৃষি থেকে পেট ও মন উভয়ই ভরার প্রভূত সম্ভাবনা। সংগীত, কলাকুশলী ও সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিদের প্রতিভার ব্যাপ্তি, বিত্ত, আভিজাত্য ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি।

কন্যা ঃ চঞ্চল মানসিকতায় কর্মক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তির সুযোগে অধস্তনের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। তবে স্ত্রীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সময়োপযোগী পদক্ষেপে ভাগ্যচক্রের গতি ত্বরান্বিত হবে। মানসম্মানের ক্ষেত্রে ও মিত্রস্থান হিতকারী নহে। বিজাতীয় সংস্পর্শে ভোগ-আড়ম্বর ও উৎফুল্লিত সময়।

তুলা ঃ ব্যক্তিত্ব, পরাক্রম, আধিপত্য, দায়িত্ব সচেতনতায় আর্থিক সুস্থিতি, গৃহনির্মাণ, ভূসম্পত্তি ও বাহন যোগ। বিদ্যার্থীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য করায়ত্ত। বিতর্কিত মন্তব্য ও আইনি জটিলতা পরিহার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় ব্যস্ততা বৃদ্ধি। বন্ধু বিচ্ছেদ ও ভ্রমণে সাবধানতা অবলম্বন জরুরি।

বৃশ্চিক ঃ গোপন শত্রুতা, কীটপতঙ্গজনিত সংক্রমণ রোগ, মূল্যবান দ্রব্য হারানো বিষয়ে সাবধানতা আবশ্যক। বিবাহপ্রার্থীদের পূর্ণতা, প্রবীণ ব্যক্তিদের সুগার, প্রেসার ক্লেশ ও ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকবে। বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, চলচ্চিত্র নির্দেশকের বহুমুখী কর্মপ্রয়াস ও সৃষ্টির আনন্দ যজ্ঞে সম্ভ্রম।

ধনু ঃ গৃহ ও মাতৃসুখ। প্রতিবেশী ভ্রাতা-ভগ্নী ও স্বজন বান্ধব সহ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সম্প্রীতি বৃদ্ধি। পুরাতন আবাসের পরিবর্তন ও সন্তানের চালচলনে আধুনিকতার পরশ, বাচালতায় বন্ধুত্ব নষ্ট। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে কর্মের যোগসূত্রে সম্পর্ক সম্মানহানিও খেসারত।

মকর ঃ পরিশ্রমই জীবনে চলার পাথেয়। আর্থিক উপার্জনের শ্লথ গতি। অর্থ লগ্নি ও ছদ্মবেশী মিত্র থেকে সতর্ক থাকুন, প্রতারণার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে চাপ, জটিলতা, উদ্বেগ, অতৃপ্তভাব, পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির সিদ্ধান্ত এবং স্ত্রীর সময়োচিত পদক্ষেপ আর্থিক সুস্থিতির সহায়ক।

কুম্ভ ঃ দরদি, অনুভবী, প্রত্যয়ী, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ও স্পষ্টবাদিতায় সাধুবাদ প্রাপ্তি ও নতুন আঙ্গিকে চলার ছন্দের গতিবিস্তার। আত্মীয়স্বজন, ভ্রাতা-ভগ্নীর পদক্ষেপে স্বস্তি ও আর্থিক প্রাবল্য সুখকর। কর্মদক্ষতার অভিনব প্রয়াসে প্রাপ্তির ভাণ্ডার প্রত্যাশা পূরণে সমর্থ হবে। পেশাদারদের মানসিক চাপ, পদোন্নতি, স্থানান্তরে বিলম্ব।

মীন ঃ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন, ভুল সিদ্ধান্তে উদ্বেগ, জটিলতা, সমালোচনা। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কূটনীতিজ্ঞ, ধর্মবেত্তা, শাস্ত্রজ্ঞের অকৃত্রিম ভালবাসার সুধাময় দৃষ্টিতে প্রভাবী ব্যক্তিত্ব ও সাফল্যে দৈবী কৃপাবর্ষণ। নীতি ও আদর্শের কাছে প্রলোভনের হাতছানি তুচ্ছ বা নগণ্য মনে হবে। দূর ভ্রমণ, সন্তানের ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তার অবসান।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য